রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ
আঁধার রাতের অতিথি
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
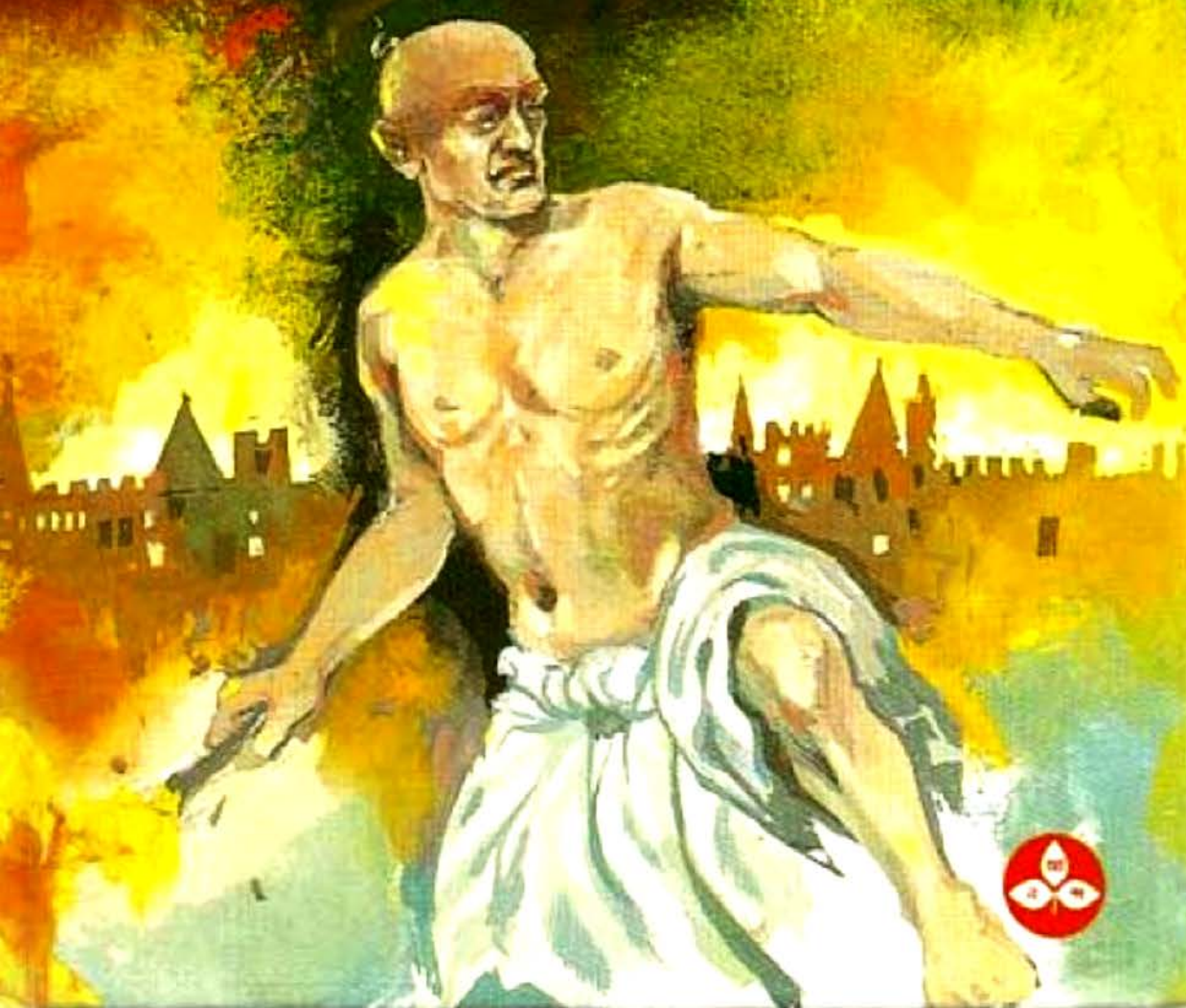
রাত্তিরে যারা ভয় পায় না তাদের জন্য

নিতাই ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "ও ঠাকুর, ঐ দ্যাখো ! ওরে বাপ রে বাপ্ ! এবার বুঝি প্রাণটা গেল !" বিশু ঠাকুর একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, নিতাইয়ের কথা শুনে চমকে মুখ তুলে তাকালেন। নিতাই আর কালু শেখকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মিশমিশে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসছিলেন। বিকেলবেলা তিনি গিয়েছিলেন মল্লিকপুরের হাটে। ফিরতে-ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। গল্প করতে-করতে কখন তাঁরা পথ হারিয়ে ফেলেছেন।

শীতকাল বলে সাপখোপের ভয় নেই অবশ্য। জঙ্গল নয়, মাইলের পর মাইল ফাঁকা মাঠ, তাই বাঘ আসবার সম্ভাবনা কম। তবে মাঝে-মাঝে নেকড়ে আর বাঘডাসা নামে বাঘেরই মতন কিন্তু একটু ছোট এক রকমের হিংস্র প্রাণী এসে পড়ে গ্রাম থেকে হাঁস কিংবা ছাগল চুরি করবার জন্য। অবশ্য বিশু ঠাকুর আর অন্য দু' জনেরই হাতে আছে শক্ত বাঁশের লাঠি। নেকড়ে বা বাঘডাসা এসে পড়লে তাঁরা পিটিয়ে শেষ করে দিতে পারবেন।

কিন্তু নিতাই ভয় পেয়েছে একটা আলো দেখে।

বিশু ঠাকুর দেখলেন, মাঠের মধ্যে অনেক দূরে একটা সাদা আলো নিয়ে কে যেন লাফাচ্ছে। লণ্ঠন বা মশালের আলো এরকম সাদা রঙের হয় না।

বিশু ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কী রে, নিতাই ?"

নিতাইয়ের তখন উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। তার দাঁতে দাঁতে ঠক্ঠক্ করে শব্দ হচ্ছে আর সে সেই অবস্থাতেই বলে যাচ্ছে "রাম-রাম-রাম-রাম-রাম..."

কালু শেখের অবস্থা ততটা খারাপ না হলেও সে এর মধ্যে মাটিতে বসে পড়েছে। সেই অবস্থায় বলল, "ও ঠাকুর মশায়, আজ বুঝি মলাম। শিগগির চক্ষু ঢাকো ! শিগগির !"

বিশু ঠাকুর তখনও বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা। তার সঙ্গী দু' জনের এরকম অবস্থা হল কেন শুধু একটা আলো দেখে ?

তিনি বললেন, "আরে তোদের কী হল ? কে ওখানে আলো নিয়ে নাচানাচি করছে ?"

নিতাই তখনো বলে চলেছে, "রাম-রাম-রাম-রাম..."

কালু শেখ বলল, "এখনো চক্ষু ঢাকোনি ? তোমার রক্ত চুষে খেয়ে নেবে। ও হল আউলো ডাকিনি !"

বিশু ঠাকুর বললেন, "আউলো ? তার মানে কি আলেয়া ? ছোটবেলায় বাবার মুখে অনেক গল্প শুনেছি বটে, কিন্তু আগে কখনো দেখিনি। কী করে ঐ আলেয়া ?"

কালু শেখ বলল, "ও হল মায়াবিনী সর্বনাশিনী। মানুষকে আগে ঘুরোয়ে ঘুরোয়ে মেরে ফেলে, তারপর তার বুকের রক্ত চুষে খায়।"

বিশু ঠাকুর এবার হেসে বললেন, "হ্যাঃ ! রক্ত চুষে খাওয়া অত সোজা ! কেন, আমাদের হাতে লাঠি আছে না ?"

কালু শেখ বলল, "ও ঠাকুর, তুমি কও কী ? তুমি লাঠি দিয়ে পেত্নির সঙ্গে লড়তে চাও ! এমন অলুক্ষুনে কথা মনেও এনোনি। হে বাবা মানিকপির, হে বাবা কালীগঞ্জের মুর্শেদ, বাঁচায়ে দাও, আমাদিকে এবারের মতন বাঁচায়ে দাও !"

বিশু ঠাকুর দুই চোখ তীক্ষ্ণ করে আবার সামনের দিকে দেখলেন। এবার আলোটাকে সত্যিই যেন মনে হল একটা মেয়ের মূর্তি। সাদা রেশমের কাপড় পরা একটি মেয়ে, সে তিড়িং তিড়িং করে নাচছে।

তিনি বললেন, "তোরা এখানে বোস্, আমি কাছ থেকে ভাল করে দেখে আসি।"

নিতাইচরণ আর কালু শেখ যতই ভয় পাক, তারা বিশু ঠাকুরকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে। এই বিশু ঠাকুর পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাত থেকে তাদের প্রাণে বাঁচিয়েছে।

তারা দু'জনে সঙ্গে-সঙ্গে দু' দিক থেকে বিশু ঠাকুরের দু' হাত ধরে বলে উঠল, "না, ঠাকুর, তুমি যেতে পারবা না, কিছুতেই যেতে পারবা না !"

বিশু ঠাকুর বেশ বিরক্ত হলেও তাঁর এই অনুগত ভক্তদের ওপর তিনি রাগ দেখালেন না। জোর করে হেসে বললেন, "আরে, তোরা এরকম শিশুর মতন আচরণ করছিস কেন ? আমি হলুম গে শিব ঠাকুরের পূজারী, আমায় কখনো ভূত-প্রেত কোনো ক্ষতি করতে পারে ? বললুম তো, তোরা বোস এখেনে, আমি একটু কাছে গিয়ে দেখে আসি।"

নিতাই আর কালু শেখ একেবারে কেঁদে ফেলল এবারে। তারা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বিশু ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, "না, তুমি যেতে পারবা না ! তুমি কিছুতেই যেতে পারবা না ! ও ঠাকুর, তোমার এ

কী দুর্বুদ্ধি হল। আউলোর কাছে গেলে কেউ বাঁচে না!"

কিন্তু তারা গায়ের জোরে বিশু ঠাকুরের সঙ্গে পারবে কেন? বিশু ঠাকুরের শরীরে অসুরের মতন শক্তি। তিনি এক ঝট্‌কায় ওদের দু'জনকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, "বললুম না, তোরা এখেনে বসে থাক। আমি ঝটিতি ঘুরে আসছি।"

তিনি লাঠিটা বাগিয়ে ধরে দৌড় লাগালেন।

বিশু ঠাকুর পরে আছেন মালকোঁচা-মারা ধুতি আর একটা আলোয়ান। খালি পা। মাথায় চুল নেই, শুধু মোটা এক গোছা টিকি। দৌড়োবার সময় আলোয়ানটা খুলে পড়ে যাচ্ছিল বলে তিনি ভাল করে জড়িয়ে নিলেন।

একটুখানি দৌড়োবার পরই তিনি বুঝতে পারলেন যে, জলকাদার মধ্যে এসে পড়েছেন। অল্প-অল্প জল, তার নীচে নরম কাদা। তবু তিনি না থেমে সোজা সেই আলোয় গড়া মেয়েটির দিকে ছুটলেন।

সেই মেয়েটিও ক্রমশই দূরে যাচ্ছে। এখন আর সে নাচছে না, লাফিয়ে-লাফিয়ে পালাচ্ছে যেন। বিশু ঠাকুর মনে মনে বললেন, পালাবে কোথায়? আমি ওকে ঠিক ধরব। দেখতে হবে, ও কেমন ডাকিনী!

আলেয়া-ডাকিনী একবার ডান দিকে, একবার বাঁ দিকে সরে গিয়ে ছলনা করছে বিশু ঠাকুরের সঙ্গে। বিশু ঠাকুর এক একবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন মেয়েটিকে। তার মুখের কাছে যেন রক্তের দাগ। একবার যেন তিনি তাঁর তীক্ষ্ন খিলখিল হাসির শব্দও শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন, এই ডাকিনী যদি সত্যিই মানুষের রক্ত শুষে খায়, তবে তো আজই একে ঠাণ্ডা করে দেওয়া দরকার!

যেতে যেতে হঠাৎ ভুল করে বিশু ঠাকুর এক জায়গায় প্রায় কোমরজলে নেমে গেলেন, তাঁর পা দুটো গেঁথে গেল কাদায়। আর সঙ্গে-সঙ্গে দপ্‌ করে আলেয়ার আলোও নিভে গেল।

এতক্ষণ বাদে শরীরটা ছমছম করে উঠল বিশু ঠাকুরের। এমন অন্ধকার হয়ে গেল যে, নিজেকে পর্যন্ত দেখা যায় না। বিশু ঠাকুর বুঝতে পারলেন না, আলোটা হঠাৎ একেবারে নিভে গেল কী করে! জোর হাওয়াও তো বইছে না! এইরকম ভাবেই কি আলেয়া-ডাকিনী মানুষের রক্ত শুষে খায়?

তিনি সেই কাদা থেকে ওঠবার চেষ্টা করছেন কিন্তু আরও বেশি করে পা গেঁথে যাচ্ছে। এখানকার কাদায় বিচ্ছিরি পচা-পচা গন্ধ। তিনি এখন

ইচ্ছে করলেও পালাতে পারবেন না। তিনি দু' হাত তুলে গলা ঢেকে রইলেন, যেন হঠাৎ কেউ গলা টিপে ধরতে না পারে।

অনেকক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু কেউ এল না।

তারপর এক সময় তিনি আবার আস্তে-আস্তে জল থেকে উঠে আসবার চেষ্টা করলেন। নরম ভুশভুশে কাদায় বেশি নড়াচড়া করলেই বিপদ। হাতের লাঠিটাও গাঁথা যাচ্ছে না, অনেক দূর নেমে যাচ্ছে।

কোনো রকমে একটা পা টেনে তুলে খুব সন্তর্পণে পেছন দিকে সেই পা-টা রাখলেন। তারপর অন্য পা তোলার চেষ্টা করলেন।

এই রকম ভাবে অনেকক্ষণের চেষ্টায় বেশ কিছুটা উঠে এসেছেন, এমন সময় তাঁর খুব কাছেই হুশ করে আলোটা আবার জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল একটা ভয়ংকর রকমের হি-হি-হি-হি হাসি।

বিশু ঠাকুর দারুণ চমকে গেলেন, তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন সেই আলোর মধ্যে একটি সতেরো-আঠেরো বছরের মেয়ে জ্বলন্ত চোখে হিংস্রভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু কয়েক পলক মাত্র। তারপরই সেই আলো মিলিয়ে গেল। আবার সেই নিদারুণ অন্ধকার। আর কোনো শব্দও নেই।

বিশু ঠাকুর প্রথমে ভাবলেন, এইবার সেই ডাকিনী তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দু' হাতে লাঠিটা ধরে তিনি প্রাণপণ শক্তিতে বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে লাগলেন তাঁর মাথা ঘিরে। সেইভাবে কতক্ষণ ধরে তিনি ঘোরালেন তার খেয়াল নেই। সেই আলো আর জ্বলল না, কেউ এলও না।

তখন লাঠি ঘোরানো থামিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে ওখানে? কে আলো জ্বেলেছিল?"

কোনো উত্তর নেই।

আবার তিনি চড়া গলায় জানতে চাইলেন, "কে? কে লুকিয়ে আছ অন্ধকারে? উত্তর দাও! কোনো ভয় নেই!"

এই রকম ভাবে কয়েকবার চেঁচিয়েও তিনি কোনো সাড়াশব্দ পেলেন না। এতক্ষণ পরে তাঁর মনের জোর চলে গেল। তিনি খুব ক্লান্ত বোধ করলেন। এখন যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে তাঁর গোড়ালি পর্যন্ত জল। তবু তাঁর ইচ্ছে করল ঐ জলের মধ্যেই বসে পড়ে একটু বিশ্রাম নিতে।

সেই জলের মধ্যে বসে পড়ার পরও তার মনে হল, এতেও ভাল লাগছে না। এখন শুয়ে পড়লেই সবচেয়ে আরাম হবে।

তিনি সত্যি-সত্যি শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন সেই সময় শুনতে পেলেন দূর থেকে কারা যেন ডাকছে, "ঠাকুর মশায়, ও ঠাকুর মশায়—"

তখন তাঁর মনে পড়ল, তিনি তো নিতাইচরণ আর কালু শেখকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে এসেছেন।

তিনি তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন। খুব অবাক হয়ে ভাবলেন, তিনি এ কী করতে যাচ্ছিলেন ? এরকম জায়গায় কেউ শোয় ? এ-ও কি ডাকিনীর মায়া ?

তিনি খুব জোরে উত্তর দিলেন, "নি-তা-ই রে ! ও কা-লউ শে-খ ! তো-রা কো-থা-য় ?"

ওদিক থেকে উত্তর এল, "ঠা-কু-র ম-শা-য় ! আ-প-নি কো-ন দি-কে ?"

আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে সেই শব্দ শুনে বিশু ঠাকুর দিক বুঝে নিলেন। তারপর সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোলেন সেই দিকে।

গায়ের আলোয়ানটা জল-কাদা মেখে ভারী হয়ে গেছে। শীতের কাঁপুনিও লাগছে। তবু সেই অবস্থায় কয়েক পা গিয়েও বিশু ঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন। তারপর কী যেন ভেবে তাঁর হাতের লাঠিটা কাদার মধ্যে গেঁথে দিলেন ভাল করে। লাঠিটাকে সেই অবস্থায় রেখে দিয়ে তিনি এগুতে লাগলেন নিতাইচরণ আর কালু শেখের দিকে।

নিতাইচরণ আর কালু শেখ কিন্তু এক পাও এগোয়নি। যেখানে বসে ছিল, সেইখান থেকেই হাঁকডাক করছে। ওরা নাকি সেই প্রথম থেকেই একটানা ডেকে চলেছে। কিন্তু বিশু ঠাকুর এতক্ষণ ওদের গলার আওয়াজ শুনতে পাননি।

যাই হোক, বিশু ঠাকুরকে ফিরে পেয়ে ওরা আনন্দে একেবারে কেঁদে ফেলল।

নিতাই বলল, "ঠাকুর, তুমি সত্যি বেঁচে আছ ? তোমায় ডেকে ডেকে আমার গলা কাঠ হয়ে গেল। এমনভাবে ভগবানকেও কোনোদিন ডাকিনি। তুমি অনেক পুণ্য করেছ ঠাকুর, তাই আউলো ডাকিনী তোমার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে পারেনি !"

কালু শেখ বলল, "ঠাকুর, তুমি সত্যি-সত্যি আউলো ডাকিনীরে

দ্যাখলা ? সে তোমার রক্ত চুষে খেতে ধেয়ে আসেনি ?”

বিশু ঠাকুর এখন কিন্তু ওদের সঙ্গে হাসি-তামাশা করতে পারলেন না। চিন্তিতভাবে বললেন, “হ্যাঁ রে, সত্যিই দেখলুম যেন মনে হল। ওরকম ফটফটে সাদা রঙের আলো তো রাতের অন্ধকারে আগে দেখিনি। তার মধ্যে একটা মেয়ের মুখ, বড় রাগী, কটমট করে তাকাল আমার দিকে। কেন বুঝলুম না।”

কালু শেখ বলল, “তোমার সাতপুরুষের ভাগ্যি যে তুমি বেঁচে গেছ। ওর সামনে গেলে কেউ কোনোদিন বাঁচে বলে শুনিনি।”

নিতাই বলল, “ঠাকুর, তোমার শিবপূজা করা সার্থক। ভূত-পেরেত-ডাকিনী-পিশাচিনী সবই শিবের চেলা-চামুণ্ডা। তাই তোমাকে দেখে চিনতে পেরে পিছু হটে গেছে। নইলে ওরা কারুকে ছাড়ে না।”

কালু শেখ বলল, “আমার এক চাচারেই তো সারা রাত ধরে মাঠের মধ্যে ঘুরোয়ে-ঘুরোয়ে মেরে ফেলেছে। বেয়ানে (সকালে) যখন তারে পাওয়া গেল, তখন তার গলা আর বুকের কাছে খাবলা-খাবলা মাংস নাই।”

বিশু ঠাকুর বললেন, “তা হলে তো বড় চিন্তার কথা। জ্যান্ত মানুষের রক্ত-মাংস খেয়ে নেবে, ভূত-প্রেতের এ অত্যাচার তো সহ্য করা যায় না।”

নিতাই বলল, “তা বলে তুমি কি ভূতের সঙ্গে লড়াই করবে নাকি ? ও সব কথা মনেও স্থান দিও না। দেখলে না তোমার মত মানুষকেই কী নাজেহালটাই না করলে। তোমার শরীরের অবস্থা দেখেছ ?”

কালু শেখ বলল, “এ অলুক্ষুনে জায়গায় আর থাকা ঠিক না। চলো, আমরা হাঁটা দিই।”

বিশু ঠাকুর দূরের অন্ধকারের দিকে আর একবার তাকালেন। কিন্তু আর সেই আলোটা দেখা গেল না।

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “চল্।”

॥ ২ ॥

দুর্দান্ত জলদস্যু গঞ্জালেসকে আর তার দলবলকে বন্দী করে মুঘল সেনাপতির হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন বিশু ঠাকুর। সেই জন্য মুঘল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ খুশি হয়ে বিশু ঠাকুরকে এক বিশাল জায়গির উপহার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশু ঠাকুর নেননি। তিনি সবিনয়ে জানিয়েছিলেন যে, তিনি সামান্য একজন ব্রাহ্মণ পূজারী, তিনি অত বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কী করবেন!

আসলে বিশু ঠাকুর মনে মনে খুব অহংকারী। তিনি কারুর কাছ থেকে দান গ্রহণ করেন না।

আবার তিনি ফিরে এসেছিলেন নিজের গ্রামে।

কিন্তু সেখানে এসেও তিনি কিছুটা মুশকিলে পড়লেন। গ্রামের লোকরা ঘোঁট পাকিয়ে বলল, বিশু ঠাকুর এতদিন বোম্বেটেদের জাহাজে কাটিয়েছেন, তাদের হাতের জল ও খাবার খেয়েছেন, সুতরাং তাঁর জাত গেছে। অতএব তিনি আর মন্দিরের পূজারী হতে পারবেন না।

এ-কথা শুনে বিশু ঠাকুর তো একেবারে হতবাক। পর্তুগিজ জলদস্যুরা এই সব গ্রামের মানুষদের ধরে-ধরে ক্রীতদাস হিসেবে চালান দিত। বিশু ঠাকুরের জন্যই তা বন্ধ হয়েছে, অথচ এই তার প্রতিদান? মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়?

আসলে তখন মানুষের মনের মধ্যে বড় অন্ধকার। দলাদলি আর কুসংস্কারের জন্য বাঙালী জাতি সেই সময় দিন-দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়াবার মতন মনের জোরও হারিয়ে ফেলেছে।

সেই গ্রামে বিশু ঠাকুরের বুড়ি মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। জলদস্যুরা বিশু ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যাবার পর অনেক দিন তিনি ছেলের কোনো খবর না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মরেই গেলেন একদিন। তাঁর ছেলে যে কত বড় সাহসের কাজ করে কত মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে, সে-কথা তিনি জানতেও পারলেন না।

পৃথিবীতে বিশু ঠাকুরের আর আত্মীয় বলতে কেউ নেই। গ্রামের লোকদের ঐরকম কথা শুনে এক সময় তিনি রাগে-দুঃখে ঠিক করেছিলেন

এই গ্রাম ছেড়ে চিরকালের মতন চলে যাবেন। আর কোনোদিন এদের মুখ দেখবেন না।

তারপর আবার ভাবলেন, কোথায়ই বা যাবেন। সব জায়গাতেই তো একই অবস্থা। অন্য কোথাও গেলে তাঁকে পরিচয় গোপন করে থাকতে হবে। কিন্তু কেন তিনি নাম বদলাবেন, তিনি তো কোনো অপরাধ করেননি!

বিশু ঠাকুর যে ফিরিঙ্গিদের খাবার একদিনও মুখে তোলেননি, সে-কথা তিনি বললেন না। তিনি গ্রামের লোকদের জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ঐ শিব মন্দিরেই থাকবেন, আগের মতন রোজ তিনিই পুজো করবেন। দেখা যাক কে তাঁকে সেখান থেকে হঠাতে পারে।

সেই গ্রামে আর কোনো ব্রাহ্মণ নেই। এতদিন এই মন্দিরে পুজোই হয়নি। বিশু ঠাকুর শুরু করে দিলেন পুজো। সেই মন্দিরই হল তাঁর ঘরবাড়ি।

গ্রামের লোকদের মধ্যে কারুর অবশ্য এত সাহস নেই যে, বিশু ঠাকুরকে সেখান থেকে জোর করে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। তা ছাড়া স্বয়ং মুঘল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ যাঁকে খাতির করেন, তাঁর গায়ে হাত তোলাও বিপজ্জনক।

গ্রামের লোক কেউ আর সেই মন্দিরে আসে না। দূর থেকে শুধু বিশু ঠাকুরের নিন্দে করে।

পর্তুগিজ জাহাজ থেকে যে-সব ক্রীতদাসদের বিশু ঠাকুর মুক্তি দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন কিন্তু বিশু ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়েনি। তারা রোজ আসে বিশু ঠাকুরের কাছে। তারা থাকে কাছাকাছি গ্রামে, তাদেরও একই অবস্থা। ফিরিঙ্গি ছুঁয়েছিল বলে তাদের জাত গেছে। তাদের একঘরে করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রামের কোনো লোক তাদের নেমন্তন্নও করবে না, কেউ তাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আসবেও না। শুধু তাই নয়, যে-পুকুর থেকে গ্রামের লোক জল নেয়, সেই পুকুরের জল এরা ছুঁতে পারবে না।

নিতাই এসে বিশু ঠাকুরের কাছে বলেছিল, "ঠাকুর, আমাদের কী দোষ বলো তো? আমরা কি ইচ্ছে করে পর্তুগিজদের হাতে ধরা দিয়েছিলুম, না নিজে থেকে মেঙে (চেয়ে) খাবার খেয়েছি? কোনো রকমে তোমার দয়ায় প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি, সেটাও শেষে দোষ হল? কই, মুসলমানদের

মধ্যে তো জাত যায় না। আমাদের কেন জাত যাবে ?”

বিশু ঠাকুর বললেন, “দ্যাখ্, আমি তো কিছু পুঁথি-পত্তর পড়েছি, আমাদের শাস্ত্রও কিছু পড়েছি। কোথাও তো জাত যাবার কথা লেখা নেই। রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেজন্য কি তাঁর জাত গিয়েছিল ?”

নিতাই বলেছিল, “রামচন্দর তো ভগবান, তাঁর আবার জাত যাবে কী করে ? আমরা হলুম গে সামান্য মানুষ—”

বিশু ঠাকুর বললেন, “ভগবানই তো মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাই না ? তা হলে আমরা সবাই ভগবানের ছেলে। ভগবানের যদি জাত না যায়, তবে তাঁর ছেলেদের কেন জাত যাবে ? শোন্, প্রায় শ'খানেক বছর আগে নদিয়া জেলায় এক মস্তবড় মহাপুরুষ জন্মেছিলেন। অনেকে বলে, তিনিও ভগবানের একজন অবতার। তাঁর নাম নিমাই ঠাকুর, পরে তাঁর নাম হয়েছিল চৈতন্য ঠাকুর। তিনি বলতেন, বামুন, মুসলমান, কায়স্থ, শুদ্র, ডোম, সবাই মানুষ, সবাই সমান। তিনি সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। অতবড় মহাপুরুষ কি ভুল বলতে পারেন ?”

দারুক নামে একজন বলল, “ঐ চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্যদের আমি দেখেছি। তাদের বলে বোষ্টম। তাদের মাথা ন্যাড়া হয়। গাজিপুরের হাটে দেখেছিলুম, কয়েকজন বোষ্টম খোল-কর্তাল বাজিয়ে গান গাইছে। আহা, বড় সুন্দর গান। একটা গানের কথা এখনো আমার মনে আছে, 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।”

চরণদাস নামে আর-একজন বলল, “আ-হা-হা! কী চমৎকার কথা, শুনলে চোখে জল এসে যায়। সব মানুষ সমান। জমিদারবাবুও মানুষ, আমিও মানুষ, আমাদের মধ্যে কোনো ফারাক নেই!”

নিতাই বলল, “কিন্তু ঠাকুর, তুমি ব্রাহ্মণ, আর আমি শুদ্দুর, তুমি আর আমি সমান হতে পারি ? তুমি কত লেখাপড়া জানো, তোমার কত বুদ্ধি, আর আমরা তো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ....”

বিশু ঠাকুর বললেন, “শোন্, অবস্থার দোষে কিংবা চেষ্টার অভাবে অনেকে মুখ্যু থাকে। নিজের চেষ্টায় বড় হতে হয়। আমি কিছুদিন এক মৌলবি সাহেবের কাছে পড়াশুনো করেছিলুম। সেই মৌলবি সাহেব

আমাকে কতকগুলো বড় আশ্চর্য ইতিহাস শুনিয়েছিলেন। অনেককাল আগে সেকেন্দার শাহ্ নামে এক মহা শক্তিশালী গ্রিক রাজা আমাদের এই হিন্দুস্থান আক্রমণ করেছিলেন। সব দেশটাই দখল করে নিতেন, কিন্তু পুরু নামে এক ছোট রাজা যুদ্ধে খুব সাহস দেখিয়ে তাঁকে আটকে দিলেন। তবেই দ্যাখ, মনের জোর থাকলে ছোট হয়েও বড়র সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। আরও আশ্চর্য কথা, সেই সময় চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন মহাশক্তিশালী মানুষ গ্রিকদের তাড়িয়ে দেশের রাজা হলেন। সেই চন্দ্রগুপ্ত নাকি ছিলেন দাসীর ছেলে।"

নিতাই বলল, "বলো কী ঠাকুর, দাসীর ছেলে হল রাজা ?"

বিশু ঠাকুর বললেন, "শুধু রাজা নয় রে, সম্রাট !"

দারুক বলল, "মহাভারতের গল্পে শুনিছি, কর্ণকেও তো সবাই ছুতোর মিস্তিরির ছেলে বলে জানত ! তবু মহাবীর বলে তেনাকে মান্যগণ্য করত সবাই !"

বিশু ঠাকুর বললেন, "তা হলেই বুঝলি, কতকগুলো মুখ্যু গাঁয়ের লোকের কথামতন মানুষের জাত যায় না ! আর জাতের জন্যই মানুষ বড় ছোট হয় না !"

দারুক বলল, "তবে একটা কী কথা জানো ঠাকুর। এই যুগটাই পড়েছে অন্যরকম। এখন ধর্মকথা কেউ শোনে না। এখন জোর যার মুল্লুক তার। গ্রামের লোক যদি এককাট্টা হয়ে আমাদের মেরে তাড়াতে আসে ?"

বিশু ঠাকুর বললেন, "সেজন্য আমাদেরও শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আমরা শক্তিশালী হলে দেখবি সবাই আমাদেরও ভয় পাবে।"

সেই থেকে নিতাই, দারুক আর তাদের দলবল এই শিব-মন্দিরের সামনের চাতালে প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা লাঠি, বল্লম, শরকি চালানো শেখে। এখন তাদের দলে প্রায় পঞ্চাশজন লোক জুটেছে। ঐ সব খেলার সময় তাদের হা-রে-রে-রে চিৎকার শুনলে দূর থেকেও মানুষের বুক কাঁপে।

গ্রামের লোকেরা আর ভয়ে কেউ সে-তল্লাটে যায় না। অনেকে বলে, বিশু ঠাকুর ডাকাতের দল খুলেছে।

আসলে ব্যাপারটা তার ঠিক উলটো। বিশু ঠাকুর যখনই খবর পান কাছাকাছি কোনো গ্রামের নিরীহ, গরিব মানুষের ওপর কেউ অত্যাচার করছে অমনি তিনি দলবল নিয়ে হাজির হন, আর দুষ্ট-বদমাসদের পিটিয়ে

হাড়গোড় ভেঙে দেন।

দেশে এখন বড় অরাজক অবস্থা। দিল্লির বাদশা এখন ঔরঙ্গজেব, তিনি নিজেই সেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে খুব ব্যস্ত, এত দূর দেশের দিকে নজর দেবার সময় পান না। তা ছাড়া তিনি বাংলা মুল্লুককে খুব একটা পছন্দও করেন না। নেহাত তাঁর সম্মানে ঘা লেগেছে বলেই তিনি তাঁর সেনাপতি শায়েস্তা খাঁকে পাঠিয়েছেন পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করবার জন্য।

বিশু ঠাকুর জলদস্যুদের সর্দার গঞ্জালেস টিবাওকে তার কয়েকখানি জাহাজ সমেত শায়েস্তা খাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে যে, সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ সেই জলদস্যুদের বন্দী করে কোনো শাস্তি না দিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছেন। ঢাকা শহরের ফিরিঙ্গি বাজারে থাকবার জায়গা দিয়েছেন তাদের সবাইকে, তাদের খাওয়া-দাওয়ারও কোনো রকম অসুবিধে রাখেননি।

আসলে শায়েস্তা খাঁ-র মূল উদ্দেশ্য হল আরাকান রাজ্য আক্রমণ করা। কারণ, আরাকানের রাজা বাদসা ঔরঙ্গজেবের পলাতক ভাই শাহ সুজাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেইটাই তো ঔরঙ্গজেবের অত রাগের কারণ।

কিন্তু আরাকান যেতে হবে জলপথে। মোগলরা জলপথ তেমন চেনেও না, জলযুদ্ধে পটুও নয়। সেইজন্যই শায়েস্তা খাঁ চান পর্তুগিজ জলদস্যুদের কাজে লাগাতে। দস্যুসর্দার গঞ্জালেস টিবাও-ও শায়েস্তা খাঁর ভাল ব্যবহারের বিনিময়ে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

শিবগঞ্জ থেকে ঢাকা শহর অনেক দূরে। এই সব গাঁয়ের মানুষ কেউ অত দূরে যায় না। দেশের শাসনব্যবস্থা খুব দুর্বল বলে চোর ডাকাত খুনে আর ঠ্যাঙাড়েদের উৎপাত এত বেড়েছে যে, সাধারণ মানুষ নিজের নিজের গ্রাম থেকে আর বেরুতেই চায় না।

তবু মাছ ধরার নৌকোগুলো পথ হারিয়ে প্রায়ই অনেক দূরে দূরে চলে যায়, তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার ছ'মাস ন'মাস পরে ফিরেও আসে। ব্যবসায়ীরাও প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করে। এই সব মানুষের মুখে কিছু কিছু খবরও পাওয়া যায়।

ভয়ংকর দস্যুসর্দার গঞ্জালেস টিবাও-এর কোনো শাস্তি হয়নি, বরং সে স্বাধীন ভাবেই এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনে নিতাইচাঁদ আর কালু শেখরা ভয় পায়। তাদের ধারণা, বিশু ঠাকুর গঞ্জালেসকে যে অপমান করেছেন,

তা সে কখনো ভুলবে না। সে যে-কোনো উপায়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেই। জলদস্যুর প্রতিহিংসা অতি সাঙ্ঘাতিক। এই নিয়ে কত গল্প-কথা আছে!

বিশু ঠাকুর এ-কথা শুনে হাসেন। তিনি বলেন, "আরে না, না। গঞ্জালেস আবার এত দূরে আসবে? সে সাহস তার নেই।"

মাঝে-মাঝে তিনি ঠাট্টা করে তাঁর সঙ্গীদের বলেন, "তা হলে একবার ঢাকা শহর ঘুরে আসি, কী বল্? দেখি গিয়ে আমার হাতের আরও দু'একটা চড়-চাপড় খাওয়ার শখ হয়েছে নাকি গঞ্জালেসের!"

সে-কথা শুনে নিতাইরা ভয়ে বিশু ঠাকুরের হাঁটু চেপে ধরে বলেন, "খবর্দার ঠাকুর, ওরকম কথা মনে স্থানও দিও না! গঞ্জালেস আর একবার তোমায় হাতে পেলে কিছুতেই ছাড়বে না!"

এইরকম ভাবে প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। এখন বিশু ঠাকুরের দলের নাম শুনলেই চোর-ডাকাত অত্যাচারীরা ভয়ে থরথর করে কাঁপে। আশপাশের প্রায় কুড়ি-পঁচিশখানা গ্রামে এখন শান্তি বিরাজ করছে। সব জায়গায় এখন আর বিশু ঠাকুরকে দল নিয়ে যেতেও হয় না। কোনো গ্রামে হয়তো ডাকাত পড়েছে, এমন সময় গ্রামের কিছু লোক এমনি এমনি চেঁচিয়ে ওঠে 'ঐ বিশু ঠাকুর আসছেন! আর ভয় নেই!'

সেই কথা শুনেই ডাকাতেরা চোঁ-চোঁ করে দৌড়ে পালায়।

বিশু ঠাকুরের গ্রামের যে-সব লোক তার জাত গেছে বলেছিল, তাকে একঘরে করতে চেয়েছিল, এখন তারাই এসে হাত কচ্‌লে বলে, "ঠাকুর, তুমি সাক্ষাৎ দেবতা! তুমি না থাকলে আমাদের কী হত! তুমি আমাদের ধনেপ্রাণে রক্ষা করেছ!"

তাই শুনে বিশু ঠাকুর মুচকি হেসে বলেন, "আমি সাক্ষাৎ দেবতা? তা বেশ তো! আজ তোমরা তা হলে এই দেবতার প্রসাদ খেয়ে যাও! বদন মিঞা আর বংশী ডোম আজ খিচুড়ি রান্না করছে। সেই খিচুড়ি আমি প্রসাদ করে দেব, তোমরাও সকলের সঙ্গে বসে খাবে।"

সেই কথা শুনে বোকা গ্রামবাসীরা এক পা এক পা করে পিছিয়ে তারপর দৌড় মারে। দু'একজন থেকেও যায়। গ্রামের সাধারণ ঘরের সাহসী ছেলেরা একজন দু'জন করে এসে বিশু ঠাকুরের দলে যোগ দেয়।

এইরকম ভাবে দিন বেশ ভালই কাটছিল এক রকম। কিন্তু সেদিন হাট থেকে ফেরার পথের ঘটনাটা বিশু ঠাকুরকে খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানো অনেক গল্প শুনেছেন, কিন্তু নিজের চোখে কখনো কিছু দেখেননি। মাঝে-মাঝে শোনা যায় বটে যে পেত্নিতে কার গলা মুচড়ে দিয়েছে কিংবা কাদের বাড়ির বাগানে এক ব্রহ্মদৈত্য এসে বেলগাছের ডাল ভেঙে দিয়ে গেছে। কালু শেখও কয়েকবার মাছখেকো ভূতের কথা শুনিয়েছে। সন্ধেবেলা ছিপ দিয়ে মাছ ধরলেই বাড়ি ফেরার পথে কয়েকটা বেঁটে বেঁটে ভূত পেছন-পেছন আসে আর বলে, 'মাঁছ দেঁ না! মাঁছ দেঁ না!'

বিশু ঠাকুর এসব গল্প কখনো ঠিক বিশ্বাস করেননি।

কিন্তু সেদিন তিনি নিজের চোখে যা দেখলেন, তা অবিশ্বাস করবেন কী করে? ফাঁকা মাঠের মধ্যে ধপধপে সাদা রঙের গোল ধরনের আলো আপনা-আপনি জ্বলে উঠল কী করে? ওরকম অদ্ভুত আলো তো তিনি আগে কখনো দেখেননি! তা ছাড়া ঐ আলোর মধ্যে তিনি মাঝে-মাঝে একটি মেয়ের মুখও দেখতে পাচ্ছিলেন, বেশ রাগী ধরনের মুখ। একবার হি-হি-হি-হি হাসিও শুনতে পেলেন। তারপর সব কিছুই অদৃশ্য হয়ে গেল। এ আবার কী রকম ব্যাপার!

যতই তিনি ভাবেন, ততই তিনি এ-রহস্যের কোনো কূলকিনারা খুঁজে পান না। অন্য কেউ এরকম একটা কাহিনী শোনালে তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এবার যে তাঁর নিজের চোখে দেখা।

এর মধ্যে একদিন কার্তিকপুর গ্রাম থেকে একটা খবর এল। সে গ্রামের দু'জন লোক এসে কেঁদে বলল, তাদের গ্রামে হঠাৎ খুব বাঘের উপদ্রব হয়েছে। দু'তিনটে বাঘ প্রায়ই গ্রামে ঢুকে পড়ে গরু-ছাগল টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এমন কী মানুষও মারছে। এ পর্যন্ত সাতজন গ্রামবাসী গেছে বাঘের পেটে। এখন বিশু ঠাকুর রক্ষা না করলে তাদের আর কোনো উপায় নেই।

বিশু ঠাকুর বেশ বিরক্ত হলেন কথাটা শুনে। লোক দুটিকে ধমক দিয়ে বললেন, "তোদের গায়ে কি মানুষের রক্ত নেই? বাঘ পড়েছে বলেও তোরা আমাদের সাহায্য চাইতে এসেছিস? কেন, তোরা গ্রামের লোক সবাই মিলে বাঘ তাড়াতে পারিস না?"

লোক দুটি বলল, "ঠাকুর, আমাদের গেরামে কারুর তরোয়াল-বন্দুক নেই, আমরা খালি হাতে বাঘ মারব কী করে?"

বিশু ঠাকুর বললেন, "তরোয়াল-বন্দুক নেই, কিন্তু গ্রামে বাঁশঝাড় তো

আছে ? তোদের লাঠি নেই ? তিরিশ-চল্লিশজন লোক একসঙ্গে লাঠি নিয়ে তেড়ে গেলে বাঘ-সিংহ তো ছেলেমানুষ, ব্রহ্মদৈত্য পর্যন্ত পালাবে !"

লোক দুটি তবু বোকার মতন কুঁই-কুঁই করে কাঁদতে থাকে।

বিশু ঠাকুরের দল এ পর্যন্ত কখনো বাঘের সঙ্গে লড়াই করেনি। সেইজন্যই নিতাই আর কালু শেখ উৎসাহের সঙ্গে বলল, "চলো ঠাকুর। আমরা বাঘ মেরে আসি।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "না রে। এ ভাবে চললে তো হবে না ! গ্রামের লোকরা যদি নিজেরা দল বেঁধে শত্রু তাড়াতে না শেখে, তা হলে আমরা আর কত সাহায্য করব ? লোকে ভাববে, বিপদে পড়লে তো বিশু ঠাকুরের দল এসে বাঁচাবেই, সুতরাং আমরা খাই-দাই আর ঘুমোই ! উঁহু ! এ ঠিক নয়, আমাদের এত কী দায় পড়েছে ! এর পর দেখবি কোনো গ্রামে শিয়ালের উৎপাত হলেও লোকে আমাদের কাছে ছুটে আসবে !"

কার্তিকপুর গ্রামের লোক দুটি বলল, "ঠাকুর, চোর-ডাকাতদের সঙ্গে তবু লড়াই করা যায়। কিন্তু সুন্দরবনের বাঘ যে সাক্ষাৎ যম ! তাদের ডাক শুনলেই পিলে চমকে যায়, হাত-পা একেবারে অবশ হয়ে পড়ে। ঐ বাঘে সঙ্গে লড়াই করার সাধ্য আমাদের নেই।"

বিশু ঠাকুর রাগ করে বললেন, "সাধ্য নেই তো বাঘের পেটে যাও আমি কী করব ?"

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিশু ঠাকুরকে যেতেই হল। তাঁর দলের লোকজনদেরই উৎসাহ বেশি।

বিশু ঠাকুর তখন ঠিক করলেন, তাঁর দল থেকে মাত্র চারজন লোককে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কার্তিকপুর গ্রামের লোকদেরও লাঠিসোঁটা নিয়ে যেতে হবে তাঁর সঙ্গে। তাদের গ্রামের শত্রু তাড়াবার জন্য তাদেরও লড়াই করা শিখতে হবে।

কার্তিকপুর গ্রামখানি মাত্‌লা নদীর ধারে। শিবগঞ্জ থেকে একবেলার পথ। বিশু ঠাকুর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দুপুর-দুপুর পৌঁছে গেলেন কার্তিকপুরে।

গ্রামখানি মাঝারি ধরনের। শ-দেড়েক পরিবারের বাস। অধিকাংশ লোকই মাছ ধরে কিংবা চাষবাস করে। গ্রামের ডান দিকে ঘন জঙ্গল, কিন্তু এতদিন সেখানে বাঘ ছিল না। মাতলা নদী পেরিয়ে দুটো বাঘ এসে

সেখানে আস্তানা গেড়েছে।

গ্রামের লোকজনদের মধ্য থেকে বেছে-বেছে পঁচিশজন স্বাস্থ্যবান ছেলেকে একটা আলাদা জায়গায় দাঁড় করালেন বিশু ঠাকুর। তারপর তাদের বললেন, "শোনো, তোমাদের প্রত্যেককে লাঠি ধরতে হবে। আর বাঘ যখন আসবে, তখন শুধু একটা কথা মনে রাখলেই চলবে। প্রত্যেকে ঠিক করে রাখবে, তাকে একবার অন্তত লাঠির ঘা বসাতেই হবে বাঘের গায়ে। প্রত্যেকে একবার করে মারলেই আমার চলবে। যে মারতে পারবে না, সে পুরুষ মানুষ নয়। কী, মনে থাকবে?"

সবাই একবাক্যে বললেন, "হ্যাঁ!"

আগের দিন রাত্রেই বাঘ গ্রাম থেকে একটা মোষ টানতে টানতে নিয়ে গেছে জঙ্গলের কিনারায়। সেখানে আধ-খাওয়া অবস্থায় সেটাকে ফেলে রেখে চলে গেছে। বিশু ঠাকুর আগে একা সেই মোষটাকে দেখে এলেন। বাঘের স্বভাব-চরিত্র তিনি খানিকটা জানেন। একবার শিকার করা পশুর মাংস সবটা শেষ না করা পর্যন্ত বাঘ সাধারণত নতুন শিকার ধরে না। সুতরাং এই মোষটাকে খাবার জন্য বাঘ আবার এখানে ফিরে আসবে।

দিনের আলো থাকতে থাকতেই বিশু ঠাকুর সবাইকে নিয়ে চলে এলেন জঙ্গলের প্রান্তে। আধখানা চাঁদের আকারে তিনি লোকজনদের বসিয়ে দিলেন সেই মোষটাকে ঘিরে। ছোটখাটো ঝোপঝাড়ের আড়ালে প্রত্যেকে লুকিয়ে রইল।

বিশু ঠাকুর বলে দিলেন, বাঘ দেখা মাত্র যেন কেউ উঠে না দাঁড়ায়। বাঘ অতি সতর্ক প্রাণী। একটু সন্দেহ হলেই সে আর আসবে না। চারধার না দেখেশুনে সে মাংসে মুখও দেবে না। সেইজন্য সবাইকে একেবারে মুখ বুঁজে, গাছপালার মতন নিথর হয়ে থাকতে হবে। বিশু ঠাকুর যখন সংকেত দেবেন, তখন সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল, তারপরই চাঁদ উঠল। এখন পূর্ণিমা চলছে। শীতের আকাশ খুব পরিষ্কার। জ্যোৎস্না একেবারে ফট্‌ফট্ করছে দিনের আলোর মতন।

সবাই একটুও নড়াচড়া না করে ঠায় বসে আছে। এরকম ভাবে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে। হয়তো বাঘ আজ আর এদিকে আসবেই না।

কিন্তু রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ না হতেই বাঘ এল। একটা নয়। দুটো।

ঠিক যেন খেলা করছে এই রকম ভাবে ছুটোছুটি করতে করতে বাঘ দুটো বেরিয়ে এল ঘন জঙ্গল থেকে, যেন খাবার কথা ওদের মনেই নেই। এই ভাবে একজন গড়াগড়ি দিল মাটিতে, আর-একজন যেন সুড়সুড়ি দিতে লাগল তার পেটে।

তারপর কী মনে হতেই একটা বাঘ গ্রামের দিকে মুখ করে, মাটিতে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে ডেকে উঠল প্রচণ্ড জোরে।

তাতেই সব বানচাল হয়ে গেল। সেই ডাক শুনে ভয়ে কেঁপে উঠে গ্রামের সব বীরপুরুষরা উঠে দাঁড়িয়েই 'ওরে বাবা রে, মা রে' বলে লাগাল দৌড়। একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

এরকম অবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় না। বিশু ঠাকুর চিৎকার করে উঠলেন, "কেউ পালাবে না। মারো, সবাই একসঙ্গে মারো!"

তিনি নিজে সবচেয়ে প্রথমে তেড়ে গেলেন লাঠি নিয়ে। কে এল আর কে এল না তা তিনি গ্রাহ্যও করলেন না।

প্রথম যে বাঘটিকে তিনি সামনে পেলেন, তার ঠিক মুখের ওপর প্রচণ্ড শক্তিতে তিনি মারলেন লাঠির ঘা। সুন্দরবনের বাঘও তেমন সাহসী, পালাবার চেষ্টা না করে সে পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে মারল সামনের দিকে এক লাফ। সেই উড়ন্ত অবস্থাতেই বিশু ঠাকুর বাঘের ঠিক চোখ লক্ষ করে আর একবার লাঠি চালালেন।

তারপর হুড়মুড় করে কী যেন পড়ল তাঁর ঘাড়ের ওপর।

বিশু ঠাকুর সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

॥ ৩ ॥

বিশু ঠাকুর চোখ মেলে দেখলেন, নিতাই, কালু শেখ ও আরও কয়েকজন দারুণ উৎকণ্ঠিত ভাবে বসে আছে তাঁর মাথার কাছে।

তিনি প্রথমে ভাবলেন, বোধহয় তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে, সেই জন্য এরা শোক করছে। তবে কি তাঁর আত্মাটা শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে এসব দেখছে?

তিনি দু' তিনবার চোখের পাতা ফেলতেই শুনতে পেলেন, ওরা ডাকছে, "ঠাকুর, ঠাকুর?"

তখন তিনি বুঝলেন, তাহলে তিনি এখনো পুরোপুরি মরে যাননি। কী যেন হয়েছিল? একটা বাঘ তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল না? কিন্তু

একবার বাঘে ছুঁলে তো আর বাঁচবার আশা থাকে না !

তিনি উঠে বসবার চেষ্টা করে বললেন, "আমার কী হয়েছে রে ? বাঘে আমার কতখানি খেয়েছে ? আমার হাত দু'খানা আর পা দু'খানা ঠিক আছে তো ?"

নিতাই বলল, "তুমি উঠো না, ঠাকুর। শুয়ে থাকো। তোমার সব ঠিকঠাক আছে।"

বিশু ঠাকুর তবু উঠে বসে নিজের হাত-পাগুলো ভাল করে দেখলেন। সবই তো ঠিক আছে। তাহলে বাঘ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পরেও ছেড়ে দিল ?

তখন নিতাই, কালু শেখরা জানাল যে, বাঘটা বিশু ঠাকুরের ঘাড়ে পড়তে পারেনি। বাঘটা যখন লাফ দেয় সেই সময় দারুকও ছুটে এসেছিল বাঘটার দিকে। বাঘটার মুখের মধ্যে সে কুড়ুল চালিয়ে দেয়, তারপর ঝোঁক সামলাতে না পেরে দারুকও পড়ে গিয়েছিল বিশু ঠাকুরের ওপর।

বিশু ঠাকুর খুব অবাক হয়ে গিয়ে বললেন,"বাঘ নয় ? দারুক পড়েছিল আমার ওপর ? তাতেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম ? এ যে বড় তাজ্জব কথা। আর দারুকের কী হল ? বাঘ তাকে জখম করেছে ?"

জানা গেল যে, দারুকও বেঁচে গেছে খুব অল্পের ওপর দিয়ে। দারুক ও বিশু ঠাকুর এক সঙ্গে মাটিতে পড়ে যাবার পর বাঘটা তাদের ডিঙিয়ে একটু দূরে আছড়ে পড়ে। বিশু ঠাকুরের লাঠির ঘায়ে বাঘটা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর দারুকের কুড়ুলের ঘায়ে তার চোয়াল ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় সে উঠে দাঁড়াবার আগেই কালু শেখ বর্শা দিয়ে তাকে গেঁথে ফেলে।

দ্বিতীয় বাঘটা এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে আর সঙ্গীকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসেনি। বড় বড় লাফ মেরে পালিয়ে গিয়ে সে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীর জলে। সোজা সাঁতরে ওপারে চলে গেছে।

বাঘের সঙ্গে লড়াইতে শেষ পর্যন্ত বিশু ঠাকুরের দলের জয়ই হয়েছে।

বিশু ঠাকুর তবু খুশি হলেন না।

তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, "কিন্তু দারুকের মতন একটা রোগা-পাতলা লোক একটা ঠ্যালা মারল, আর তাতেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম ? আমার শরীরের শক্তি-টক্তি সব নষ্ট হয়ে গেছে ?"

নিতাই বলল, "দারুক রোগা ? সে তো রীতিমতন একটা হুমদো জোয়ান।"

কালু শেখ বলল, "আসল কথা কী জানো, ঠাকুর ? তুমি সেই যে

সেদিনকে আউলো ডাকিনীর পাল্লায় পড়েছিলে, সে নির্ঘাত তোমার খানিকটা রক্ত চুষে নিয়েছে। তাই তুমি কম-জোরি হয়ে পড়েছ।"

নিতাই তাকে ধমক দিয়ে বলল, "চুপ, ওরকম অলুক্ষুনে কথা বলবিনি ! ডাকিনীটাই তো ঠাকুরকে দেখে ভয়ে পালাল। আসলে গত বচ্ছর খানেক ধরে ঠাকুর তো একদিনের তরেও বিশ্রাম নেননি। সমানে খাটতেছেন। মানুষের শরীরে কি এত সহ্য হয় ?"

বিশু ঠাকুর কালু শেখকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেই ডাকিনী তো আমাকে ছোঁয়নি, ধারেকাছেও আসেনি, তবু সে আমার রক্ত শুষে নেবে কী করে ?"

কালু শেখ বলল, "ওরা পারে। চক্ষের দৃষ্টি দিয়েই মানুষের লহু চুষে খেয়ে নেয়।"

নিতাই আবার ধমক দিয়ে বলল, "ফের ঐ কথা ? চুপ মার ! ঠাকুর, আমি বলি কী, তুমি এখন কয়েকটা দিন বিশ্রাম নাও। শরীলটার একটু যত্ন করো। তোমার ওপর দিয়ে তো কম ধকল যায়নি ! ওরে বাপ রে বাপ, জলদস্যুগুলো তোমায় কী মার মেরেছে। ওরকম মার খেলে অন্য যে-কোনো মানুষ দশবার মরে যেত !"

কালু শেখ বলল, "ঐ জলদস্যুগুলোনরে শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় বসিয়ে জামাই আদর করতেছেন, এ-কথা ভাবলেই আমার মাথায় খুন চড়ে যায়। ইচ্ছে করে এখুনি ছুটে গিয়ে ঐ ইব্‌লিশের (শয়তানের) বাচ্চাগুলোর টুঁটি চেপে ধরি।"

নিতাই ঠাট্টা করে বলল, "অত সোজা, না ? তখন তো সবাই ভয়ে মরিছিলি ? বিশু ঠাকুর না থাকলে ফিরিঙ্গি ডাকাতদের হাত থেকে আমাদের কেউ বাঁচাতে পারত না।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "তা হলে কিছুদিন বিশ্রাম নিই, কী বল ?"

নিতাই বলল, "সেই কথাই তো বলতেছি। কিন্তু তুমি বিশ্রাম নেবেই বা কী করে। রোজই তো মানুষজন এসে তোমায় জ্বালাবে। একে তো জমিদারের পেয়াদাদের অত্যাচার, তার ওপর লেগেই আছে চোর-ডাকাতের উৎপাত। লোকে এখন বিপত্তারণ ঠাকুর হিসেবে তোমাকেই এসে ধরে। আজও তো পলাশখালি গ্রাম থেকে দু'জন লোক এসে বসে আছে।"

বিশু ঠাকুর বললেন "তা হলে এক কাজ করি বরং। কুড়ানিকে

অনেকদিন দেখিনি। কুড়ানি আর ওর বাবাকে দেখে আসি। ওরা তো থাকে মোল্লাখালিতে।"

নিতাই আর কালু শেখ মহা উৎসাহের সঙ্গে বলল, "সেই ভাল, চলো, আমরা সবাই মোল্লাখালি থেকে ঘুরে আসি।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "তোরা যাবি কোথায় ? তোরা গেলে আর আমার ঘোড়ার ডিম বিশ্রাম হবে। সব সময়েই বকবক করতে হবে তোদের সঙ্গে। তোরা এখানে থেকে কয়েকটা দিন একটু সামাল দে, আমি বেড়িয়ে আসি।"

নিতাই একেবারে চুপসে গিয়ে বলল, "তুমি একা যাবে ? আমাদের নেবে না ? পথে কত রকম বিপদ হতে পারে—"

বিশু ঠাকুর বললেন, "একা মানুষের আবার বিপদ কী ?"

নিতাই বলল, "ঠাকুর, গঞ্জালেসের চরেরা যদি তোমায় দেখতে পায়, তা হলে এবার আর ছাড়বে না। প্রথমেই জানে মেরে ফেলবে।"

বিশু ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, "আমায় চিনবে কী করে ? আমি বোষ্টম সেজে গ্রামে গ্রামে গান গাইতে গাইতে চলে যাব। বরং সুযোগ হলে একবার ঢাকা পর্যন্ত ঘুরে আসব। দেখে আসব ডাকাতেরা কী রকম জামাই-আদরে আছে।"

বিশু ঠাকুর আর ওদের কোনো ওজর-আপত্তিই শুনলেন না। পরদিনই তিনি যাত্রা করবেন ঠিক করলেন।

পরদিন সকালেই তিনি একটা পুঁটলিতে সামান্য কিছু জিনিসপত্র বেঁধে নিলেন। কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বৈষ্ণব সাজলেন, গলায় ঝোলালেন একটা হরীতকীর মালা। অবশ্য কোমরে একটা ছুরিও লুকিয়ে রাখলেন।

পাকা রাস্তা তো কিছু নেই, মাঠের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা পথ। শিবমন্দিরের পেছন দিক দিয়ে গিয়ে, বড় পুকুরটার পাশ দিয়ে এগিয়ে, একটা ছোট্ট জঙ্গল পেরিয়ে তারপর বিশু ঠাকুর মাঠের পথ ধরলেন।

শীত এবারে বেশ ভালভাবেই পড়েছে। দিনের বেলাতেই একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। এই রকম ঠাণ্ডায় রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটতেও ভাল লাগে। নিতাইরা বলে দিয়েছে যে, বিকেল পর্যন্ত হাঁটলেই তিনি গোবিন্দপুর নামে একটা বেশ বড় গ্রাম পেয়ে যাবেন। রাত্তিরটা কাটাবেন সেখানেই।

** কুড়ানি আর দস্যুসর্দার গঞ্জালেসের কাহিনী আছে এই লেখকের 'জলদস্যু' উপন্যাসে।*

গ্রামের যে-কোনো লোকের বাড়িতেই অতিথি বলে পরিচয় দিলে আশ্রয় পাওয়া যায়। তারা যত্ন করে খাবারও খেতে দেয়।

বিশু ঠাকুরের অবশ্য গোবিন্দপুরে রাত কাটাবার ইচ্ছে নেই। তার উদ্দেশ্য অন্য।

সকাল থেকে একটানা হাঁটতে হাঁটতে সূর্য যখন মাথার ওপর পৌঁছল, তখন তিনি বিশ্রাম নেবার জন্য থামলেনএকটা বটগাছের নীচে। পাশেই একটা বেশ বড় পুকুর। সুন্দর, টলটলে জল, ধারে-ধারে নারকেল গাছ আর কলাগাছ। পুকুরের জল ঝকঝক করছে রোদে।

বিশু ঠাকুর তাঁর পুঁটলিটা খুললেন। তার মধ্যে রয়েছে দুটো মাটির সরা আর কিছু চিঁড়ে, গুড় আর নারকোলের নাড়ু। খানিকটা চিঁড়ে আলাদা করে একটা সরায় নিয়ে তিনি পুকুরের কাছে গিয়ে জলে ভিজিয়ে আনলেন। তারপর অপেক্ষা করলেন খানিকক্ষণ। চিঁড়েগুলো ভিজে গিয়ে বেশ ডুমো ডুমো হবার পর তিনি গুড় দিয়ে মেখে ফেললেন। তারপর একটা একটা গেরাস পাকিয়ে খেতে লাগলেন। খেতে খেতে তাঁর মনে হল, এর সঙ্গে একটা কলা দিয়ে মাখলে আরও স্বাদ হত। পুকুরধারের কলাগাছে এক ছড়া বেশ পাকা কলা রয়েছে। কিন্তু কার না কার গাছ, তাই তিনি সেই কলাগাছটার দিকে পেছন ফিরে বসলেন। তারপর কয়েকটা নারকোল নাড়ু খেয়ে নিয়ে আবার নেমে গেলেন পুকুরের ধারে। সরাটা ভাল করে ধুয়ে তাতে করেই জল খেয়ে নিলেন অনেকটা।

এবারে তিনি পুঁটলিটা আবার বেঁধে রেখে দিলেন মাথার কাছে। তারপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। মুগার চাদরটা টেনে দিলেন গায়ে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, বটগাছটার ডালে একটা ময়না আর একটা দোয়েল ডাকছে পাল্লা দিয়ে। বড় আরাম লাগল বিশু ঠাকুরের। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন শীতকালের পরিষ্কার নীল আকাশ। একটুক্ষণের মধ্যেই তাঁর চোখ জুড়ে ঘুম এসে গেল।

বেশ অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোলেন বিশু ঠাকুর। একটা তক্ষকের ডাকে তাঁর ঘুম ভাঙল। তক্ষক এক রকমের সাপ, কিন্তু বড় গিরগিটির মতন চেহারা। ওরা 'তক্‌খো', 'তক্‌খো' করে বেশ জোরে জোরে ডাকে। এই বটগাছের কোনো কোটরে লুকিয়ে থেকে তক্ষক সাপটা ডাকল ঠিক সাতবার।

তক্ষক সাপ যদি মাথায় কামড়ায় তা হলে আর বাঁচার আশা থাকে না।

কিন্তু এই তক্ষক সাপটা বিশু ঠাকুরকে সাবধান করে দেবার জন্যই বোধহয় ডেকে উঠেছিল।

বিশু ঠাকুর উঠে বসে চোখ রগড়ে দেখলেন, বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে ম্লান আলো। তিনি ইচ্ছে করেই এতক্ষণ ঘুমিয়েছেন, কেননা, আজ বোধহয় তাঁকে রাত জাগতে হবে।

তারপরই চোখ তুলে দেখলেন, একটু দূরে দু' জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, খালি গা। দু' জনেরই হাতে দু'খানা লাঠি।

একজন বলল, "অচেনা মানুষ দেখছি। মনে হচ্ছে এ গাঁয়ের কেউ নয়।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "ঠিকই ধরেছ। আমি ভিন্ গাঁয়ের এক পথিক।"

অন্যজন বলল, "এই সোনারং গ্রামে চেনাশুনো কেউ আছে?"

বিশু ঠাকুর দু' দিকে মাথা নেড়ে জানালেন, না।

ওরা দু'জন আরও কাছে এগিয়ে এল। একজন মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ঐ পুঁটলিটায় কী আছে? খোলো তো দেখি।"

বিশু ঠাকুর অবাক হয়ে বললেন, "আমার পুঁটলি তোমাদের দেখাতে যাব কেন বাপু?"

একজন বলল, "তুমি কোনো চোরাই জিনিস নিয়ে যাচ্ছ কি না দেখব।"

আর একজন বলল, "চুপ করে বসে থাকো। নইলে লাঠির বাড়ি মেরে মাথা ফাঁক করে দেব।"

বিনা অনুমতিতেই পুঁটলিটা একজন তুলে নিয়ে খুলে ফেলল। তার মধ্যে চিঁড়ে, গুড়, নারকোল নাড়ু ছাড়া রয়েছে একখানা ধুতি আর একখানা চাদর, একটা মুর্শিদাবাদি কাঁসার ঘটি আর দু'খানি আকবরি মোহর।

সেই লোকটি বলল, "এ তো দেখছি মহাকৃপণ। রাস্তায় বেরিয়েছে, অথচ সঙ্গে বিশেষ কিছুই নেই। যাক গে, বউনির সময়, যা পাওয়া যায় তাই লাভ। চল্।"

দ্বিতীয় লোকটি বলল, "এখন একে কী করব? একে খতম করে দেব না ছেড়ে দেব?"

প্রথম লোকটি বলল, "ও যদি চুপচাপ চলে যায়, তা হলে আর রক্তারক্তি করার দরকার কী, ওহে, তুমি পেছন ফিরে একেবারে মুখটি বুঁজে

চলে যাও !”

বিশু ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “বা রে, তোমরা তো বড় মজার লোক। আমার জিনিস কেড়ে নিচ্ছ, আবার আমায় বলছ চুপ করে থাকতে। তা কখনো হয় ? দাও, আমার পুঁটলিটা ফেরত দাও !”

দ্বিতীয় লোকটি বলল, “ওরে, এর যে দেখছি মরবার শখ হয়েছে।”

বিশু ঠাকুর বললেন, “উঁহু ! আমার মোটেই মরবার শখ নেই। আমার আরও ঢের দিন বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে। আমি নিরীহ মানুষ, আমার পুঁটলিটা ফেরত দাও, চলে যাই !”

দ্বিতীয় লোকটা বলল, “তবে তুই মর !”

বলেই সে সাঁ করে লাঠি চালাল বিশু ঠাকুরের মাথা লক্ষ করে। বিশু ঠাকুর লোকটার চোখে চোখ রেখেছিলেন। সে লাঠি চালাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাথা নিচু করে ঠিক বাতাসে সাঁতার কাটবার মতন ভঙ্গিতে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটির পেটে মারলেন একটা প্রচণ্ড ঢুঁ। সে সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেল।

অন্য লোকটা লাঠি তোলবার আগেই তিনি এক হাতে তার লাঠি চেপে ধরে অন্য হাতে ঠাস করে তার গালে চড় মেরে বললেন, “বেল্লিক কোথাকার !”

এর কাছ থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন আরেক জনের দিকে। সে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বিশু ঠাকুর বললেন, “দেখি, কেমন লাঠি ধরতে শিখেছিস। মার আমাকে।”

সেই লোকটার লাঠির সঙ্গে বিশু ঠাকুরের লাঠির ছোঁয়ায় তিনবার মোটে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ হল। তারপরই সেই লোকটার হাত থেকে লাঠি উড়ে গিয়ে পড়ল অনেক দূরে।

সব ব্যাপারটাই ঘটে গেল প্রায় চোখের কয়েকটা পলক ফেলার মধ্যে।

এবারে লোক দুটিকে পাশাপাশি দাড় করিয়ে বিশু ঠাকুর তার কোমর থেকে ছুরিটা বার করলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, “এবারে তোদের পেট ফাঁসিয়ে দু'জনের নাড়িভুঁড়িতে গিট বেঁধে দেব। সেই হবে তোদের উচিত শাস্তি।”

লোক দুটো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, “আপনি নিশ্চয়ই কোনো দেবতা কিংবা ব্রহ্মদৈত্যি। আমাদের ঘাট হয়েছে। এবারকার মতন আমাদের মাপ করে দিন।”

বিশু ঠাকুর বললেন, "দেবতা নই, আমি ব্রহ্মদৈত্য। এবার তোদের রক্ত খাব। দেশের এমন অবস্থা হয়েছে যে, আমার মতন একজন গরিব লোকও নিশ্চিন্তে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারবে না?"

লোক দুটি প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, "হুজুর, এবারকার মতন দয়া করুন। আমরা আর কোনো দিন এমন কাজ করব না।"

বিশুঠাকুর বললেন, "আমার এত দয়া-টয়া নেই। যারা আমার মতন নিরীহ, দুর্বল লোকের জিনিস কেড়ে নেয়, তাদের ওপর আমার একটুও দয়া করতে ইচ্ছে করে না।"

কান্না থামিয়ে ওদের একজন চোখ বড় বড় করে বলল, "আপনি দুর্বল? চোখের নিমেষে আমাদের দু'জনকে ঘায়েল করে দিলেন!"

বিশুঠাকুর ছুরিটা আবার কোমরে গুঁজে দু'হাতে লোক দুটির ঘাড় চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, "আমি গরিব বামুন, আমার জিনিস কেড়ে নিতে তোদের লজ্জা করল না? তোদের কী শাস্তি দেব তাই ভাবছি। নাড়িভুঁড়ি ফাঁসাব, না পায়ে দড়ি বেঁধে উল্টো করে গাছে ঝুলিয়ে দেব—"

ওদের একজন বলল, "বামুন ঠাকুর, আমরা নাক-কান মলছি, আর কোনো দিন এই কাজ করব না। আমাদের ঢের শিক্ষা হয়ে গেছে, এবারকার মতন আমাদের ছেড়ে দিন।"

"ঠিক বলছিস?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ভগবানের দিব্যি নিয়ে বলছি।"

"তোদের ভগবানের দিব্যিতে কে বিশ্বাস করে? এতদিন ভগবানকে ভয় পাসনি। আজই হঠাৎ ভগবানের ওপর ভক্তি হল? ঠিক আছে, আমি এক মাস বাদে এই পথ দিয়ে ফিরব। তখনও যদি শুনি তোরা চুরি-ডাকাতি করছিস.... তোদের নাম কী?"

"জগাই আর মাধাই।"

"হুঁ! নাম দুটি তো বেশ। এক চৈতন্য ঠাকুর একবার জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন, আমিও তোদের উদ্ধার করলুম। মনে রাখিস, আমার নাম বিশ্বেশ্বর ঠাকুর!"

"অ্যাঁ? আপনিই বোম্বেটে বিশু ঠাকুর?"

এইবার বিশুঠাকুর হেসে ফেললেন। তিনি বললেন, "আমি বোম্বেটে কেন হব? আমি শিবঠাকুরের পুজো করি। একবার বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়াই করেছিলুম বটে—"

“ঠাকুর, আপনার পায়ের ধুলো দিন, ধন্য হয়ে যাই।”

“আর পায়ের ধুলো নিতে হবে না। তোরা যে পাপ করেছিস তা ধুয়ে ফেলার জন্য পুকুরে স্নান করে আয়।”

লোক দুটো আবার ভয় পেয়ে চোখ গোল গোল করে বলল, “অ্যাঁ ?”

শীতের বিকেল, শন্‌শন্‌ করে হাওয়া দিচ্ছে। এখন জলের নাম শুনলেই শরীরে চমক দেয়।

কিন্তু বিশুঠাকুর ছাড়লেন না। আঙুল উঁচিয়ে কড়া গলায় বললেন, “যা। শিগগির নাম পুকুরে। ঐ যে ভগবানের নামে দিব্যি নেওয়ার কথা বলছিলি, এখন পুকুরে তিনবার ডুব দিয়ে তারপর সেই দিব্যি নে—”

ওরা তখনও ইতস্তত করছে দেখে বিশুঠাকুর ওদের চুলের মুঠি ধরে ঠকাস করে মাথা ঠুকে দিলেন। তারপর বললেন, “তোরা জলে নামবি, না আমি তোদের পেট ফাঁসিয়ে নাড়িভুঁড়িতে গিঁট বাঁধব ?”

লোক দুটো এক পা এক পা করে নামতে লাগল জলে। বিশুঠাকুর চেঁচিয়ে বললেন, “মনে রাখিস, আমি আবার এক মাস বাদে এই পথ দিয়েই ফিরব।”

তারপর লোক দুটো ঝুপ করে জলের মধ্যে একবার ডুব দিতেই তিনি পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন।

গ্রামের মধ্যে না ঢুকে বাইরের মেঠো রাস্তা ধরেই হাঁটতে লাগলেন বিশু ঠাকুর। আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে এল। এরপর রাস্তা চেনাই মুশকিল হবে। বিশুঠাকুর যেখানে যেতে চান, মনে হচ্ছে যেন তার কাছাকাছিই এসে পড়েছেন।

একটু বাদে তিনি গোরুর গলায় ঘন্টার টুং টাং শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালেন। এক পাল গোরু নিয়ে আসছে দু'জন রাখাল। তারা কাছে এসে পড়বার পর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “হ্যাঁ গো, আগুনমারীর জলাটা কোন্‌ দিকে বলতে পারো ?”

একজন রাখাল পেছন ফিরে বলল, “ঐ যে ডান দিকের তালগাছটা দেখতেছ, ওর পশ্চিম দিকে চলে যাও, তা হলেই পেয়ে যাবে।”

একটু থেমে সে আবার বলল, “এখন ওদিকে কেন যাবে ঠাকুর ? রাতের বেলা তো ওদিকে কেউ যায় না।”

বিশুঠাকুর বললেন, “যাই দেখি, একটু কাজ আছে।”

সেই তালগাছটা লক্ষ করে সোজা চললেন তিনি। আকাশে এখনো

একটু একটু আলো আছে। একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যাবার আগেই তিনি ওখানে পৌঁছতে চান। তাই শেষ পর্যন্ত ছুট লাগালেন।

তালগাছের গোড়ায় পৌঁছে তিনি পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন শেষ সূর্যের আলোয় চকচক করছে আগুনমারীর জলা। এইখানেই তিনি আগের দিন সেই আলেয়া ডাকিনী দেখতে পেয়েছিলেন। এখানেই কোথাও তিনি পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর লাঠিটা। সেটাকে খুঁজতে লাগলেন তিনি। খানিকটা ঘোরাঘুরি করে সেটা তিনি পেয়েও গেলেন।

এদিকে এরকম বড় বড় বিল আর জলাভূমি অনেক রয়েছে। তবে এখন শীতকাল বলে আগুনমারীর জলায় জল বেশি নেই। মাঝে মাঝে জল শুকিয়ে গিয়ে ডাঙা জেগে উঠেছে, সেখানে ঝোপ-ঝাড়ও গজিয়েছে। আবার মাঝে-মাঝে জল। এখানে দিনের বেলা জেলেরা মাছ ধরতে আসে। কিন্তু সন্ধের পর আর কেউ আসে না।

একটা শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে বিশু ঠাকুর বসলেন। আগের বার রাত্রির প্রথম প্রহরেই তিনি আলেয়া ডাকিনীর দেখা পেয়েছিলেন। আজ সে কখন আসবে কে জানে।

এখান থেকে চার দিকে তাকালে শুধু দূরে দূরে দুটো একটা গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। যতদূর চোখ যায় একেবারে ফাঁকা।

খানিকবাদেই পুরোপুরি সন্ধে হয়ে গেল, কিন্তু বিশুঠাকুর একটু নিরাশ হলেন। সন্ধে হলেও পুরোপুরি অন্ধকার হল না। আকাশে দেখা দিল চাঁদ। আগের দিন অমাবস্যা ছিল। চাঁদের আলো থাকলে কি ওরা আসে ?

বিশুঠাকুর সারা রাত জেগে থাকবেন ঠিক করলেন। এক সময় না এক সময় অন্ধকার হবেই।

আরও খানিকটা বাদে একটা শব্দ শুনে বিশুঠাকুর চমকে উঠলেন। তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। শব্দটা কী রকম যেন মেয়েলি গলায় হি-হি-হি-হি হাসির মতন। আগের দিনও তিনি এই রকম হাসি শুনেছিলেন। একেই লোকে বলে পেত্নির হাসি। কিন্তু আজ বিশুঠাকুরের মনে হল, এক ধরনের মাছরাঙা পাখিও এই রকম শব্দ করে। দিনের বেলা এই রকম মাছরাঙার ডাকা সবাই শোনে, কিন্তু রাত্তিরবেলা শুনলেই অন্য রকম মনে হয়। অবশ্য, বেশির ভাগ পাখিই তো রাত্তিরে ডাকে না!

পাখিটা আর একবার হি-হি-হি-হি করে ডেকে ওঠবার পরই দপ্ করে

জ্বলে উঠল আলেয়া।

বিশু ঠাকুর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। তিনি বোঝবার চেষ্টা করলেন ঐ আলোর মধ্যে কোনো মেয়ের মুখ দেখা যায় কি না। তা তিনি আজ দেখতে পেলেন না যদিও আলোটা নিজে নিজেই লাফাচ্ছে।

আলোটা জ্বলে ওঠা মাত্র বিশুঠাকুরের ইচ্ছে হয়েছিল ঐ দিকে ছুটে যেতে। কিন্তু তিনি মনের জোর এনে চুপ করে বসে রইলেন। তিনি অনেকের কাছে শুনেছেন যে, আলেয়াকে ধরবার জন্য ছুটোছুটি করেই অনেকে রাস্তা ভুলে যায়। শেষ পর্যন্ত মারা যায়। দেখাই যাক না। ঐ আলেয়া কী করে!

আলেয়ার আলো একবার ছোট হয়, একবার বড় হয়। তাতে তার চেহারাও বদলে যায়। এক-এক সময় মনে হয় একটা মেয়ের মতন, এক-এক সময় মনে হয় একটা জ্বলন্ত গাছ।

আলোটা খানিকক্ষণ ঘুরে-ঘুরে যেন নাচ দেখাল বিশুঠাকুরকে। বিশু ঠাকুর ভাবলেন, এই আলোটা যেখান থেকেই আসুক, একে তো ভয় পাবার কিছু নেই। কোনো ডাইনি বা পেত্নি তো ওর মধ্য থেকে উঁকি মারছে না। আগের বার তিনি প্রথম দেখে ওকে ধরবার জন্য ছুটেছিলেন, তাতেই তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

একটু পরে সেই আলেয়ার আলো একটা নির্দিষ্ট গতিতে লাফাতে লাগাল। ডান দিকের একটা কোণের দিকে লাফাতে লাফাতে গিয়ে এক জায়গায় থামে, আবার কাছে ফিরে আসে। এই রকম দু'তিনবার হবার পর বিশুঠাকুর শুনতে পেলেন একটি মেয়ের কান্নার আওয়াজ।

এবার তিনি সিধে হয়ে বসলেন। এ তো আর কোনো পাখি-টাখির ডাক নয়, সত্যি কোনো মেয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ডান দিকের কোণে যেখানে গিয়ে আলেয়াটা থামছে, কান্নার আওয়াজটা আসছে সেখান থেকে।

বিশুঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাপারটা তো দেখতে হয়। আলেয়ার আলোও যেন তাঁকে ঐ দিকে যেতেই ইশারা করছে।

তিনি আলেয়াকে লক্ষ করে এগোলেন। শুকনো জায়গা ছেড়ে তাঁকে নামতে হল জলে। ঠাণ্ডা কনকনে জল। অবশ্য এখানে হাঁটু-জলের বেশি

গভীর নয়, তা তিনি আগেই দেখে নিয়েছেন।

তবু জলে নামবার পর তাঁর মনে হল, শেষ পর্যন্ত সেই তাঁকে আলেয়ার পেছনেই ছুটতে হল।

॥ ৪ ॥

খানিকটা জলা পেরিয়ে আসার পর বিশু ঠাকুর দেখলেন আর-একটা শুকনো জায়গায় শুয়ে আছে একটি মেয়ে। লাল শাড়ি পরা, সে উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। আলেয়ার আলো দপ্‌দপ্‌ করছে তার মাথার কাছে।

বিশুঠাকুর সেখানে উপস্থিত হতেই আলেয়া দূরে গেল। বিশুঠাকুর দারুণ অবাক হয়ে ভাবলেন, এখানে এই মেয়েটি এল কী করে? যখন পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি, তখন তিনি সব দিক ভাল করে দেখে নিয়েছিলেন, কোনো মানুষের চিহ্ন তো চোখে পড়েনি। এই অন্ধকারের মধ্যে মেয়েটি এল কী করে আর কেনই বা কাঁদছে? কিন্তু একটি মেয়ে সত্যিই শুয়ে আছে, এ তো আর চোখের ভুল নয়।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে মা?"

মেয়েটি অমনি ধড়ফড় করে উঠে বসল। বিশুঠাকুর দেখলেন, মেয়েটির বয়েস চোদ্দ পনরো বছর হবে, ফর্সা ফুটফুটে মুখ, মাথা ভর্তি অনেক চুল।

বিশুঠাকুরকে দেখে মেয়েটির মুখে দারুণ ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। সে হাত দুটো নাড়তে-নাড়তে বলতে লাগল, "না, না। আমায় মেরো না। আমায় মেরে ফেলো না!"

বিশু ঠাকুর বললেন, "ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। আমি তোমায় মারব কেন?"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, আমি জানি, তুমি আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছ। তুমি আমায় মেরে ফেলবে!"

"কেন, আমি তোমায় মারব কেন? আমি তো তোমায় চিনিই না।"

"তা হলে তুমি কে?"

"আমি একজন পথিক। কিন্তু এরকম জায়গায় তুমি একা একা শুয়ে কাঁদছ কেন?"

"আমার মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই, কোনো আত্মীয়-স্বজন বেঁচে নেই। তাই আমি মনের দুঃখে কাঁদছি।"

"তোমার বাড়ি কোথায় ?"

"আমার বাড়ি নেই।"

"তা বলে এরকম জায়গায় তো তোমার থাকা ঠিক নয়। এখানে কত রকম বিপদ হতে পারে।"

তারপর খানিক দূরে দপদপ করতে থাকা আলেয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "ঐ আলেয়া দেখে তোমার ভয় করেনি ?"

মেয়েটি বলল, "ওকে ভয় পাব কেন ? ও তো আমার সই। ওর নাম জবাফুল।"

"আলেয়ার নাম জবাফুল ? তা হলে আলেয়া কি মানুষ ?"

যে মেয়েটি একটু আগে অমন ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, এবারে সে হঠাৎ হি হি হি হি করে হেসে উঠে বলল, "ও মা, আলেয়া আবার মানুষ হয় নাকি ? যেমন তুমি হচ্ছ মানুষ, গাছ হচ্ছে গাছ, পাখি হচ্ছে পাখি, সেই রকম আলেয়া হচ্ছে আলেয়া।"

বিশুঠাকুর কিছুই বুঝতে পারলেন না।

এই সময় দারুণ জোরে ঘর্ঘর-ঘর্ঘর শব্দ উঠল, যেন আকাশ দিয়ে একটা রথ যাচ্ছে। মাটি কেঁপে উঠল। শাঁ শাঁ করে ঝড়ের মতন হাওয়া বইল।

তারপর শোনা গেল ঘোড়ার খুরের কপ্‌কপ্‌ কপাকপ্‌ শব্দ। সেই শব্দ এগিয়ে আসছে এদিকেই।

বিশুঠাকুর বিস্ফারিত চক্ষে দেখলেন, দুধের মতন ধপধপে সাদা রঙের দুটি ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি এসে থামল তাঁর খুব কাছে।

সেই গাড়ির ওপরে বসে আছে সহিস, তার গায়ে জরির পোশাক, মুখে মস্ত বড় গোঁফ, মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ি। তার মুখখানা যেন পাথর দিয়ে তৈরি, চোখের পলক পড়ছে না।

জুড়িগাড়ির পেছন থেকে একটা কালো, রোগা লিকলিকে লোক ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। গাড়ি থেকে নামল একজন বিশাল চেহারার পুরুষ, ধুতি আর বেনিয়ান পরা, মাথায় বাবরি চুল, দু' কানে মাকড়ি, হাতে একটি ছড়ি। দেখলেই মনে হয় কোনো জমিদার।

তাকে দেখেই মেয়েটি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। বলে উঠল, "বাবা !

আমি আর কোনোদিন আপনাকে ছেড়ে যাব না।"

জমিদারের মতন চেহারার লোকটি কটমট করে চেয়ে রইল বিশুঠাকুরের দিকে।

বিশুঠাকুর মহাবিস্ময়ে ভাবছেন, চতুর্দিকে জল, সব জায়গাটাই একটা জলাভূমি, এর মধ্যে দিয়ে এই ঘোড়ায় টানা জুড়ি গাড়ি এল কী করে ?

মেয়েটি বলল, "বাবা, বাবা, এই লোকটি আমায় জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল !

বিশুঠাকুর আবার কৌতূহলের সঙ্গে মেয়েটির দিকে তাকালেন। এইটুকু মেয়ে, কিন্তু দারুণ বিচ্ছু তো ! একটু আগে বলছিল, ওর মা-বাবা কেউ নেই। এখন আবার বাবাকে জড়িয়ে ধরে আর-একটা মিথ্যে কথা বলছে।

জমিদারের মতন চেহারার লোকটি এবার মেঘ-ডাকার মতন গম্ভীর গলায় বলল, "তোমার নাম বিশুঠাকুর না ? এসো আমাদের সঙ্গে।"

বিশুঠাকুর বললেন, "আপনি কে ? আপনি আমায় চিনলেন কী করে ?"

লোকটি হুকুমের সুরে বলল, "ওসব কথা পরে হবে। এখন ওঠো গাড়িতে !"

বিশুঠাকুর বললেন, "কেন আমি আপনার সঙ্গে যাব ? আগে বলুন, আপনি কে ?"

লোকটি হাতের ছড়িটা তুলে বলল, "যেতে তোমাকে হবেই। শুধু শুধু দেরি করে লাভ নেই। চটপট গাড়িতে উঠে পড়ো। বেশিক্ষণ এখানে অপেক্ষা করা যাবে না।"

এবার বিশুঠাকুরের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কারুর কাছ থেকে এরকম হুকুম শোনা তিনি পছন্দ করেন না।

তিনি বললেন, "আমায় যেতে হবেই ? তার মানে ? আমার ইচ্ছে না থাকলেও আমায় যেতে হবে ?"

লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "কেন, আমার সঙ্গে যেতে তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি ? তবে যে শুনেছি, তুমি খুব সাহসী ?"

"সাহসী কি ভীতু সে কথা পরে হবে। আগে বলুন আপনি কে? এই মেয়েটিই বা এখানে একা বসে কাঁদছিল কেন ? এই জলা জায়গা দিয়ে আপনার গাড়ি এল কেমন করে ?"

"তুমি যাবে, না তোমায় জোর করে তুলে নিয়ে যেতে হবে ?"

"জোর-জারি আমি একদম পছন্দ করি না। তাছাড়া, আমি নিরীহ পথিক, আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবেনই বা কেন ?"

"তোমায় নিতেই তো আমি এসেছি।"

"আমার এত বড় সৌভাগ্য কী করে হল যে এরকম একটা মস্ত বড় গাড়ি এনেছেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য ? আমি অতি সামান্য লোক, এরকম গাড়িতে জীবনে কখনো চড়িনি। আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চান ?"

"অত কথার দরকার কী ? সহিস, এই লোকটাকে দুটো রদ্দা দিয়ে ঘায়েল করো তো !"

গাড়ির ওপর থেকে এবারে নেমে এল সহিস। কোনো কথা না বলে সে বিশুঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখের পলক পড়ে না, দৃষ্টি একেবারে স্থির।

বিশুঠাকুর বললেন, "আবার বলছি, আমার গায়ে কেউ হাত ছোঁয়ালে আমার একটুও পছন্দ হয় না। আমার রাগ হয়ে যায়।"

লোকটি তবু বিশুঠাকুরকে আঘাত করবার জন্য হাত তুলল।

বিশু ঠাকুর সেই হাতটা চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, লোকটিকে শূন্যে তুলে তিনি একটা আছাড় মারবেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, লোকটির হাত ধরে তিনি একচুলও নড়াতে পারলেন না। যেন একটা লোহার স্তম্ভ !

লোকটি এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল বিশুঠাকুরের ঘাড়ে। তিনি ছিটকে পড়ে গেলেন।

ব্যথা লাগার চেয়েও বিশুঠাকুর অবাক হলেন বেশি। এর গায়ে এত জোর ? চেহারা দেখলে তো বোঝা যায় না। বিকেলবেলা বিশুঠাকুর যে-দুটো চোরকে ধরে উত্তম-মধ্যম দিয়েছেন, তাদের চেহারা তো এর চেয়ে অনেক বেশি গাঁট্টাগোট্টা ছিল।

লোকটা আর একবার মারবার জন্য নিচু হতেই বিশুঠাকুর গড়িয়ে দূরে গেলেন। আবার ওরকম মার খেলে আর তাঁর হাড়গোড় আস্ত থাকবে না।

কিন্তু এই সময় আর একটা আশ্চর্য কাণ্ড হল।

কোথা থেকে একদল ছোট ছোট পাখি চিকচিক চিকচিক করতে করতে

এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। অনেক পাখি, শত শত পাখি। অত শক্তিশালী লোকটিও সেই পাখিদের দেখে ভয় পেয়ে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল, তারপর টলতে টলতে চলে গেল গাড়ির দিকে। জমিদারের মতন চেহারার লোকটিও পাখির আক্রমণে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে! পালা! পালা!"

বিশুঠাকুর মাটি থেকে উঠে বসলেন।

উঠেই দেখলেন, তার ঠিক সামনেই সেই মেয়েটি বসে আছে। মুখে তার দুষ্টু দুষ্টু হাসি।

সে বলল, "চলো, শিগগির পালিয়ে যাই এখান থেকে। শুধু তুমি আর আমি।"

বিশুঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায়?"

মেয়েটি বলল, "এইখানে!"

বলেই সে এক মুঠো ধুলো ছুঁড়ে মারল বিশুঠাকুরের চোখে। বিশুঠাকুর জগৎ অন্ধকার দেখলেন। তারপরই তাঁর জ্ঞান চলে গেল।

॥ ৫ ॥

বিশুঠাকুরের যখন জ্ঞান হল, তখন বেশ রোদ উঠে গেছে। চোখ মেলেই তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

তিনি সেই জলাভূমির মধ্যেই একটা ছোট দ্বীপের মতন জায়গাতে রয়েছেন। কাছেই একটা ছোট খেজুরগাছ, তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। সে একদৃষ্টে তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। লোকটা পরে আছে একটা অতি ময়লা ধুতি, খালি গা, মুখভর্তি দাড়ি। খেজুর গাছের পাতা দিয়ে একটা মুকুটের মতন জিনিস বানিয়ে সে মাথায় লাগিয়ে রেখেছে।

বিশুঠাকুরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বলল, "হুঁ!"

বিশুঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?"

লোকটি সুর করে বলল

"ভাবিলাম তুমি বুঝি গিয়াছ মরিয়া
আলেয়ায় তব প্রাণ নিয়াছে হরিয়া!"

বিশুঠাকুর বললেন, "না, মরিনি। বেঁচেই তো আছি মনে হচ্ছে। তবে

কী যে ব্যাপার হল, কিছুই বুঝলাম না। তা তুমি এখানে এলে কোথা থেকে ?"

লোকটি আবার একই রকম সুর করে বলল

"তবে কী ব্যাপার হল যে বোঝে না তাই
সে কভু মনুষ্য নয়, কলুদের গাই।"

বিশুঠাকুর বললেন, "তা আমাকে গোরু বলো আর যাই বলো, আমায় খুব বোকা বানিয়েছে বটে। মাথার মধ্যে যেন সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কী যে দেখলাম সব কাল রাতে। তুমি ভাই আমায় কিছু বুঝিয়ে দিতে পারো ?"

লোকটি ফিক করে হাসল। তারপর বলল

"রাতে যাহা দেখো তুমি, দিনে সব ভুল,
আলেয়া যাহার নাম সে-ই জবাফুল।"

বিশুঠাকুর এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওসব হেঁয়ালি ছাড়ো তো। সোজা কথা কও। এই বিজন জায়গায় তুমি একা-একা কী করছ ? কোথা থেকে এসেছ ? কোন্ গাঁয়ে তোমার বাস ?"

" কুম্ভীরের পেটে থাকে ছাগলের ছানা,
বাঁশবনে যে গিয়াছে সে-ই ডোমকানা।"

বিশুঠাকুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দূর ! এ যে দেখছি বদ্ধ পাগল। এর কাছ থেকে কিছু জানা যাবে না।"

বিশুঠাকুরের ঘাড়ে ব্যথা, মাথাটা খুব ভারী লাগছে, চোখ দুটো কড়কড় করছে। সারা রাত এই শীতের রাত্রে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকার জন্য তাঁর গা ম্যাজম্যাজ করছে আর কাসি আসছে।

তিনি হাঁটুর ওপর থুতনি দিয়ে ভাবলেন, কাল রাতে সত্যিই কি ঐসব ঘটেছিল; না তিনি স্বপ্ন দেখেছেন ? এই জলা জায়গায় ঘোড়ায় টানা গাড়ি আসবে কী করে ? তারা গেলই বা কোথায় ? রাত্তিরে অত পাখিই বা এল কেন ?-রাতে তো পাখি ওড়ে না। তবে কি ওগুলো চামচিকে ? অথবা পুরোটাই স্বপ্ন ?

কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা রয়েছে, সেই লোকটা মেরেছিল। চোখ কড়কড় করছে, সেই মেয়েটা ধুলো ছুঁড়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় তিনি চমকে গিয়ে দাড়িওয়ালা পাগলটার দিকে তাকালেন। এই পাগলটা একবার বলল, 'আলেয়া যাহার নাম সে-ই

জবাফুল'। কাল রাত্তিরে সেই দুষ্টু মেয়েটাও বলেছিল যে, আলেয়ার নাম জবাফুল। তা হলে এই পাগলটাও কি মেয়েটাকে দেখেছে?

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে, তুমিও কি কোনোদিন একটি মেয়েকে এখানে কাঁদতে দেখেছিলে? আলেয়ার সঙ্গে যে-মেয়েটির ভাব আছে?"

দাড়িওয়ালা লোকটি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী যেন চিন্তা করল। থুতনিতে আঙুল ঠেকাল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল

"চক্ষু আছে তবু অন্ধ, কান আছে, কালা,
বক্ষে ধরিলাম সর্প, এ যে গুঞ্জামালা!"

বিশুঠাকুর বললেন, "ওরে বাপ রে এ যে দেখি স্বভাবকবি। তা, তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটে কী ভাবে? আহার কোথায় পাও?"

লোকটি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে আবার ফিক করে হাসল। মেয়েদের মতন লজ্জায় মুখটা ঘুরিয়ে নিল। তারপর হঠাৎ জলে নেমে ছপছপ করে দৌড়ে গিয়ে আর একটা দ্বীপের মতন জায়গায় উঠে পড়ল। সেখানেও সে দাঁড়িয়ে রইল বিশুঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

বিশুঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কোন্ দিকে যে গ্রাম তা তিনি ঠাহর করতে পারলেন না। তবে বেশ খানিকটা দূরে তিনি দেখতে পেলেন দু' তিনজন মানুষকে। তারা জাল ফেলে মাছ ধরছে।

বিশুঠাকুর সেদিকেই যেতে লাগলেন। কখনো জল ভেঙে, কখনো শুকনো ডাঙার ওপর দিয়ে। কোনো একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে কথা বলবার জন্য তিনি খুব ব্যাকুলতা বোধ করছেন।

দাড়িওয়ালা লোকটিও একটু দূরে দূরে থেকে তাঁকেই অনুসরণ করছে।

জেলেরা দু'জন বয়স্ক লোক আর একটি বাচ্চা ছেলে। তারা বিশুঠাকুরকে দেখে বেশ চমকে উঠল। বাচ্চা ছেলেটি মাছের খালুই রেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে একজন বয়স্ক লোকের পেছনে দাঁড়াল।

সেই লোকটি জল থেকে খুব আস্তে আস্তে জাল টেনে তুলছিল। কোনো জেলে এই রকম সময় কথাও বলে না, জাল তোলাও থামায় না। এই লোকটি থামিয়ে দিয়ে মুখ তুলে কড়া গলায় বলল, "তুমি কে?"

অন্য বয়স্ক লোকটি একটা মাছ-মারা বল্লম তুলে নিল হাতে।

বিশুঠাকুর বললেন, "আমি একজন পথিক। পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছি। আমি এক ব্রাহ্মণ পূজারী।"

ব্রাহ্মণ শুনেই লোক দুটি হাত জোড় করে প্রণাম জানাল।

তারপর একজন জিজ্ঞেস করল, "বামুনঠাকুর, তোমার মুখে ও কী হয়েছে ?"

বিশুঠাকুর সঙ্গে-সঙ্গে নিজের মুখে হাত দিলেন। তাঁর হাতে রক্ত লেগে গেল।

তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে আমার মুখে বলো তো ?"

একজন জেলে বলল, "তোমার সারা মুখ কে যেন ফালা ফালা করে চিরেছে মনে হয়।"

বিশুঠাকুর বললেন, "কী জানি ! কাল রাতে তো এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর কী হয়েছে জানি না !"

জেলে দু'জন পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর একজন বলল, "তুমি কাল রাতের বেলা এখানে ছিলে ? আর একটু এগিয়ে এসো। দেখি তো তোমার গোড়ালি কোন্‌দিকে। জলে তোমার ছায়া পড়ে কি না।

বিশুঠাকুর ওদের কথা মতন কাছে এগিয়ে এলেন।

জেলে দু'জন ভাল করে দেখে বলল, "হুঁ, বড় আশ্চর্য ! সবই তো ঠিক আছে দেখছি ! দ্যাখো, ঠাকুর, এই জলায় রাত কাটালে কেউ জীয়ন্ত থাকে না। দিনের বেলাতেও বেশি কেউ আসে না এদিকে। যে দু'চারজন আসে, তাদের আমরা চিনি। সেইজন্যই তোমার মতন একজন অচেনা মানুষকে দেখে প্রথমটা আমরা একটু চেতিয়ে গেস্‌লাম।"

"কেন, এ জায়গায় বেশি লোক আসে না কেন ?"

"জায়গাটার অনেক দোষ আছে। রাত্তিরবেলা শুধু তেনাদের রাজত্ব। রাতে কেউ পথ ভুলে এদিকে এসে পড়লে তার আর নিস্তার নেই। তুমি বেঁচে আছ বলেই আমরা বড় তাজ্জব হয়েছি।"

"ঐ দাড়িওয়ালা লোকটি কে ?"

"ও একটা পাগল। ও তোমারই মতন একজন ভিন্‌দেশী পথিক একদিন এদিকে পথ ভুলে এসে পড়েছিল। প্রাণে বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু মাথাটি একেবারে গোল্লায় গেছে। ও এখানেই ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। আমরাই ওকে খেতে পরতে দিই।"

এখানে এসে কেউ কেউ মারাও যায় বলছ ?"

"প্রায়ই তো দেখি একজন না একজন হাত পা খিচিয়ে পড়ে আছে।

ঘাড় ভাঙা। এই তো এই আদিত্যবারের আগের আদিত্যবারেও একজন মরেছে। আহা, বড় ফুটফুটে চেহারা ছিল তেনার। নিশ্চয়ই কোনো ভাল বংশের ছেলে।"

"কে মারে এই সব লোকদের, তা তোমরা খোঁজ নাও না ?"

"এ তো সবাই জানে। মারে আলেয়ায়। বেভুল পথিক এ তল্লাটে এলেই আলেয়ার খপ্পরে পড়বে।"

"তবু তোমরা যে এদিকে আসো, তোমাদের ভয় করে না ?"

"দিনের বেলা তো কেউ কোনোদিন আলেয়া দেখেনি। কোনো ভূত-প্রেতও দিনের আলোয় দেখা যায় না। ওনাদের কারবার শুধু অন্ধকারে। যে-সব দিনে মেঘ ঘনিয়ে আঁধার হয়, সে সব দিনে আমরা শিগগির শিগগির বাড়ি চলে যাই।"

বিশুঠাকুর আর কথা বাড়ালেন না। তাঁর শরীর বেশ দুর্বল লাগছে, দাঁড়িয়ে থাকতেও ভাল লাগছে না। কাছাকাছি গ্রাম কোন্ দিকে সেই সন্ধান জেনে নিয়ে তিনি আবার হাঁটতে লাগলেন।

কিন্তু তিনি গ্রামে গেলেন না। খানিকদূর এসে একটা বেশ নিরিবিলি গাছ দেখে তিনি থামলেন। বিলের জলেই হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে তিনি বসলেন আহ্নিক করতে।

তারপর আহ্নিক সারা হয়ে গেলে তিনি তাঁর পুঁটলি খুলে চিঁড়ে-গুড় আর নাড়ু খেলেন। এরপর ভাবতে বসলেন যে, এবার কী করবেন।

অন্য যে-কোনো লোক হলেই এরপর চলে যেত এই অঞ্চল ছেড়ে অনেক দূরে। এখানে যা সব কাণ্ড ঘটছে, গায়ের জোর দিয়ে তা আটকাবার কোনো উপায় নেই। বিশুঠাকুরের মতন শক্তিমান লোককেও সেই সহিস এক কিল মেরে ধরাশায়ী করে দিয়েছিল। হঠাৎ ছোট-ছোট পাখি বা চামচিকেগুলো এসে না পড়লে তিনি বোধহয় আর প্রাণে বাঁচতেন না।

এখানে রাত্তিরবেলা কোনো মানুষ এলে হয় সে মরে, অথবা পাগল হয়ে যায়। একজন পাগলকে তো তিনি নিজের চোখেই দেখলেন। লোকটা বোধহয় আগে কোনো যাত্রাদলে গান গাইত।

কিন্তু হার স্বীকার করে ফিরে যাবার মতন মানুষ নন বিশু ঠাকুর। ঘোড়ার গাড়ির সহিস তাকে অমনভাবে মারল, এর শোধ নিতে না পারলে তিনি কোনোদিন শান্তি পাবেন না।

সারাদিন তিনি সেখানেই ঠায় বসে রইলেন।

দিনের বেলা এ জায়গা দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কয়েক ক্রোশ জুড়ে এই জলাভূমি একেবারে শান্ত, নিস্তব্ধ। জলের মধ্যে এখানে-সেখানে ফুটে আছে শাপলার ফুল, সেগুলোর কাছে ঝাঁক-ঝাঁক ফড়িং ঘুরঘুর করে। কোথাও পাড়ের কাছে এক পা তুলে তপস্বীর মতন চোখ বুজে বসে আছে সাদা ধপধপে বক। মাঝে-মাঝে এক একটা মাছরাঙা পাখি কি-রি-কি-রি করে ডাকতে ডাকতে ঝুপ করে পড়ে যাচ্ছে জলে।

বিশুঠাকুর ভাবলেন, কাল যে ছোট-ছোট কালো রঙের অসংখ্য পাখি দেখেছিলেন, সেগুলো কোথায় গেল? তাদের তো একটাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। রাতের বেলা যে-পাখি ওড়ে, দিনের বেলা তাদের দেখা যায় না, এ তো বড় বিচিত্র কথা।

একবার তিনি দেখলেন, জল থেকে একটা গো-সাপ উঠে আসছে তার দিকে। বিশুঠাকুর নড়া-চড়া করলেন না, ব্যস্ত হলেন না, একই জায়য়ায় বসে রইলেন চুপ করে।

গো-সাপদের দেখতে বেশ ভয়ঙ্কর হয় বটে, কিন্তু আসলে তারা নিরীহ প্রাণী। ড্যাবডেবে চোখ মেলে সেটা চেয়ে রইল আর চড়াত চড়াত করে লম্বা জিভ বার করতে লাগল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এল সামনে।

বিশুঠাকুর বললেন, "এই, এদিকে আসিস না! যাঃ, যাঃ!"

মানুষের গলার আওয়াজ পেয়েই গো-সাপটা ভীতুর মতন হুড়মুড়িয়ে নেমে গেল জলে।

বিকেল হতে না হতেই সেই জেলেরা তাদের জাল গুটিয়ে ফিরে গেল গ্রামে। পাগলটিকে বিশুঠাকুর আর দেখতে পেলেন না।

তারপর সন্ধে নামল।

আজ যেন শীত একটু বেশি। মাঝে-মাঝে জোলো হাওয়া দিচ্ছে আর গা একেবারে কনকন করছে। কাল রাতে বিশুঠাকুরের গায়ের চাদরটা জল কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। সকালে তিনি সেটা কেচে দিয়েছিলেন, সারাদিন ধরে শুকিয়েছে। এবারে তিনি সেই চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিলেন গায়ে।

কাল তিনি যেখানে আলেয়া দেখেছিলেন, আজ তিনি তার থেকে অনেক দূরে বসে আছেন। তবে আলেয়ার আলো এমন জোরালো যে, অনেক দূর থেকেও দেখতে পাওয়ার কথা।

আকাশে আজ বেশ ভাল রকম একটা চাঁদ আছে। সেইজন্য ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়। দূরের গাছগুলোও আবছা-আবছা দেখা যায়।

প্রথমে তিনি দেখতে পেলেন কয়েকটা জোনাকি। এলোমেলো ভাবে উড়ছে। ঠিক যেন বাতাসের গায়ে তারা আঁকবার চেষ্টা করছে কোনো ছবি। সত্যি এক সময় জোনাকিরা কাছাকাছি এসে গেল, তাদের আলোতে গড়ে উঠল একটি মেয়ের মুখ।

'বিশুঠাকুর ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই তাঁর চোখের ভুল।

জোনাকিগুলো আবার ছিটকে যেতে সেই মুখের ছবি ভেঙে গেল। বেশ জোর একটা দমকা হাওয়া এসে তাদের উড়িয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরে।

তারপরই কে যেন বিশুঠাকুরের গায়ের চাদরটা ধরে টান দিল।

তিনি চমকে উঠে 'কে, কে' বলে উঠলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না, চাদরটা খুলে গেল তাঁর গা থেকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সেটা ধরবার চেষ্টা করলেন। তার আগেই চাদরখানা উড়ে গিয়ে পড়ল জলে।

চারদিকে তাকিয়ে বিশুঠাকুর কারুকে দেখতে পেলেন না। তবু তাঁর দারুণ রাগ হয়ে গেল। চাদরটা কে টেনে নিল? বাতাস? এই শীতের মধ্যে ভিজে চাদরটা তো আর গায়ে দেবার কোনো উপায়ও রইল না। জলে না নেমে তিনি লাঠি দিয়ে চাদরটাকে টেনে আনলেন কাছে।

এবার গাছের ওপর থেকে ছড় ছড় করে জল পড়তে লাগল তাঁর গায়ে। কে যেন এক কলসি জল উপুড় করে দিয়েছে ওপর থেকে। গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লাগলে যেমন লাগে, ঠাণ্ডার সময় গায়ে হঠাৎ জল পড়লেও সেই রকম বোধ হয়।

তিনি ওপরে মুখ তুলে কড়া গলায় বললেন, "কে? কে ওখানে? আমার সঙ্গে রসিকতা হচ্ছে?"

কেউ সাড়া দিল না।

তিনি ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই সেই পাগলটার কাজ। কখন চুপি-চুপি এসে গাছের ওপর উঠে বসে আছে।

তিনি গাছের গুঁড়িটা ধরে নাড়া দিতে দিতে বললেন, "নেমে আয় বলছি! নইলে এই গাছসুদ্ধু উপড়ে ফেলে দেব।"

কেউ নেমে এল না। তিনি ভাল করে দেখলেন, গাছের ওপর কেউ নেই।

বিশুঠাকুরের শরীর দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। গাছের ওপর কেউ নেই, তবু জল পড়ল তাঁর গায়ে। তা হলে কি সত্যিই...

একটা গলা-খাঁকারি শুনে তিনি চমকে পাশে তাকাতেই দেখলেন দু'জন লোক তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে একজনের চেহারা বেশ ঘি-দুধ খাওয়া নাদুস-নুদুস ধরনের, কোঁচানো ধুতি আর জরিদার রেশমের ফতুয়া পরা, মুখখানা হাসি হাসি।

অন্য লোকটি রোগা-প্যাংলা, কুচকুচে কালো রং, একটা মালকোঁচা-মারা ধুতি পরা, খালি গা। মুখখানা গোমড়া। চোখ দুটো পিটপিট করছে অনবরত।

এরকম দু'জন লোককে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কীরকম যেন অস্বাভাবিক লাগে। অবশ্য রাত্তিরবেলায় নির্জন জলা জায়গায় দু'জন লোককে হঠাৎ দেখতে পাওয়া আরও অস্বাভাবিক ব্যাপার।

বিশু ঠাকুরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নাদুস-নুদুস লোকটি বলল, "এই যে, বিশু, তুমি আজও এখেনে রয়েছ দেখছি। তা বেশ, বেশ!"

বিশুঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কে?"

লোকটি অমায়িক ভাবে হেসে বলল, "দ্যাখো বাপু, আমাদের একটা নিয়ম আছে। প্রথম থেকেই পষ্টাপষ্টি বলে দেওয়া ভাল। আমাদের কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। তার কোনো জবাব পাবে না। আমরা যা জিজ্ঞেস করব, তার তুমি চটপট উত্তর দেবে। বুঝলে?"

বিশুঠাকুর ঠাট্টার সুরে বললেন, "এটা আপনাদের নিয়ম। তা, ঐ নিয়ম যে আমাকেও মানতে হবে তার কোনো মানে আছে?"

লোকটি আগের মতনই বেশ সন্তুষ্টভাবে হেসে বলল, "তা বাপু তোমাকে মানতেই হবে। আমাদের কর্তাবাবুর এই হুকুম।"

"আপনাদের কর্তাবাবু কে?"

"সেই প্রশ্ন করলে তো? বললাম না, কোনো প্রশ্নের উত্তর পাবে না। বরং, তুমি বলো তো, তুমি পরপর দু'রাত এখেনে কী করছ?"

"আপনি জানলেন কী করে যে আমি কালও এখানে ছিলাম?"

"আবার প্রশ্ন? বলছি না উত্তর পাবে না।"

"এ তো ভারী মজা। আপনি নিজে প্রশ্ন করে যাবেন, আর আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারব না? শুনুন মশাই, লোকের হুকুম শোনার অভ্যেস আমার নেই।"

"ওহে বিশু, শুধু-শুধু মাথা গরম কোরো না।"

"আপনি আমায় 'বিশু বিশু' বলে ডাকছেন, আর 'তুমি' বলে কথা বলছেন কেন ? আমিই বা তা হলে আপনি বলতে যাব কেন ? আমি তুই বলব। তুই কে রে ব্যাটা ?"

"হে হে হে হে ! এ লোকটা দেখছি নাছোড়বান্দা। উত্তর পাবে না, তবু প্রশ্ন করে চলে। ওহে নিধি, একে নিয়ে কী করা যায় বলো তো ?"

রোগা-প্যাংলা গোমড়ামুখো লোকটি বলল, "ছোটকর্তা, আপনি অযথা সময় নষ্ট করতেছেন। কাজ শুরু করে দিন না !"

নাদুস-নুদুস লোকটি বলল, "সেই ভাল ! সময় বেশি নেই। কখন যে ওরা এসে পড়বে, তার ঠিক নেই তো ! ওহে বিশু, তুমি নাকি বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছ ? আমি এই যে নিধিরাম সর্দারকে এনেছি, তুমি ওর সঙ্গে লড়াই করো তো একটু দেখি !"

বিশুঠাকুর অনেক ভেবে-ভেবেও কিছু কূলকিনারা পাচ্ছেন না। এরা কারা, হঠাৎ কী করে এখানে এল, কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি।

লোকটির কথা শুনে খুব বিরক্তভাবে তিনি বললেন, "আমার গায়ের চাদর খুলে নিয়েছে কে ? আমার গায়ে জল পড়ল কী করে ? এই লোকটার সঙ্গে আমি লড়াই করতেই বা যাব কেন ?"

লোকটি জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, "বিশু, তুমি কে, কী, কেন ছাড়া আর কোনো কথা জানো না ? তুমি নিধিরামের সঙ্গে লড়াই করতে চাও কি না বলো দেখি চটপট ?"

নিধিরাম সর্দার বলল, "ছোটকর্তা, অত কথার দরকার কী ? এই লোকটাকে পট্‌কে দিই ?"

রোগা-প্যাংলা লোকটার স্পর্ধা দেখে বিশুঠাকুর হতবাক্‌ হয়ে গেলেন।

তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "তোরা যে-ই হোস না কেন, আপদ দূর হয়ে যা। আমি বেশি রেগে গেলে কিন্তু তোদের কপালে দুঃখ আছে।"

দুটি লোকই একসঙ্গে হিহি হিহি করে হেসে উঠল। নিধিরাম সর্দার তার রোগা লিকলিকে একটা হাত বিশুঠাকুরের কাঁধে রেখে বলল, "কী রে ছেলে, তোর খুব তেজ, তাই না ?"

বিশুঠাকুর আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। তিনি নিধিরামের টুঁটি চেপে ধরে ওকে একটু শিক্ষা দিতে চাইলেন। কিন্তু ওকে তিনি এক চুল নড়াতে পারলেন না। বরং নিধিরাম সর্দারই এক হাতে একটা

বেড়ালছানার মতন বিশুঠাকুরকে শূন্যে তুলে ধরল। তারপর চারদিক ঘুরিয়ে বিশুঠাকুরকে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলের মধ্যে।

দু'তিনবার ডুব দিয়ে বিশুঠাকুর ভেসে ওঠবার পর শুনতে পেলেন চর্তুদিকে খুব জোর ঢাকের শব্দ হচ্ছে। বাতাস বইছে খুব জোরে। আকাশের তারারা জায়গা পালটা-পালটি করছে।

তিনি বুঝলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় এসে গেছে। আর কোনো আশা নেই। এই লোক দুটো মানুষ নয়, এরা পিশাচ। এদের হাতেই অচেনা পথিকেরা এখানে এসে মরে। তিনিও ওদের সঙ্গে পারবেন না।

কিন্তু একটা কথা তিনি বুঝতে পারলেন না। এরা মানুষ মারে কেন ? তাতে এদের কী লাভ ?

কনকনে ঠাণ্ডা জলে বিশুঠাকুরের শরীর প্রায় জমে যাচ্ছে। তবু তিনি অন্য কোনো দিকে পালাবার চেষ্টা করলেন না। জল ভেঙে ভেঙে সেই শুকনো ডাঙাতেই ফিরে এলেন।

লোক দুটি এখন আর দাঁড়িয়ে নেই, বসে আছে মাটিতে উবু হয়ে।

বিশু ঠাকুরকে দেখে নাদুস-নুদুস লোকটি বলল, "বা বা বা বা ! তুমি মরোনি তা হলে, বেঁচে আছ ? বেশ, বেশ, তোফা ! তোমায় দিয়ে কাজ হবে।"

রোগা-প্যাংলা লোকটি বলল, "ছোটকর্তা, এ ছেলেটার বেশ এলেম আছে বলতে হবে। জান্ বেশ কড়া। একে নিয়ে গেলে কর্তাবাবু খুশি হবেন।"

ছোটকর্তা বলল, "একে নিয়ে যাবার জন্যই তো এসেছি। একটু বাজিয়ে দেখছিলাম। নিধি, তুই ওর হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।"

নিধিরাম সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এসো গো, ছেলে। আমার হাত ধরো। আর যেন বেগড়বাঁই করতে যেও না, তা হলে আর একবার জলের মধ্যে নাকানি-চুবোনি খাবে। চলো আমার সঙ্গে।"

বিশুঠাকুর আর কোনো প্রতিবাদ করলেন না। তিনি লোকটির পিছু-পিছু চলতে লাগলেন।

নাদুস-নুদুস লোকটি বলল, "কই গো, জবাফুল, একটু বাতি দেখাও !"

অমনি দপ্ করে জ্বলে উঠল আলেয়া। খুব কাছেই। ঠিক যেন নেচে নেচে সেই আলো তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

শুকনো ডাঙা ছেড়ে তাদের নামতে হল জলকাদার মধ্যে। কিন্তু বেশি

দূর যেতে হল না।

এক জায়গায় এসে সেই আলেয়ার আলো একটা অত্যন্ত লম্বা মানুষের হাতের আরতির ধুনুচির মতন ঘুরতে লাগল চারদিকে। সেই আলোয় বিশুঠাকুর দেখলেন একটা মস্ত বড় রাজপ্রাসাদ। তার দেউড়িতে দু'জন দারোয়ান, ভেতরে একটা জুড়িগাড়ি আর একটা পাল্‌কি।

ধাপ ধাপ শ্বেতপাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে বাড়িটির সামনের দিকে। সেই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে অতি বৃদ্ধ একজন মানুষ।

নিধিরাম সর্দার বলল, "ওহে ছেলে, ঐ যে আমাদের কর্তাবাবু। ওনার সামনে গিয়ে কিন্তু গড় কোরো। জেদ দেখিয়ে ঘাড় উঁচু করে থেকো না, তা হলে ঘাড়টি ভেঙে দেব। তুমি বামুন হতে পারো, কিন্তু আমাদের কর্তাবাবুও বোষ্টম।"

বিশুঠাকুর কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেলেন। জলে পড়ার সময় তিনি যে প্রবল ঢাকের শব্দ শুনেছিলেন, সেই রকমই আবার যেন শত শত ঢাক বেজে উঠল একসঙ্গে। বিশুঠাকুরের বুকের মধ্যেও যেন ঐ রকম একটা ঢাক বাজছে।

কয়েক পা এগোবার পরই হঠাৎ থেমে গেল ঢাকের শব্দ। তার ফলে অসম্ভব চুপচাপ হয়ে গেল চার দিক। বাতাসেরও যেন কোনো শব্দ নেই।

নিধিরাম যাকে কর্তাবাবু বলল, সেই লোকটির বয়েস সত্তরের কাছাকাছি হবে। খুবই শুকনো চেহারা। বয়েসের ভারে শরীরটা একটু বেঁকে গেছে। এই শীতের মধ্যেও তার গায়ে একটা ফিনফিনে পাতলা কাপড়ের বেনিয়ানের মতন জামা, আর কোঁচানো ধুতি। বৃদ্ধটি এক হাতে কোঁচার খুঁট ধরে আছে, অন্য হাতে একটি ছড়ি। ছড়িটি সোনা-বাঁধানো।

বৃদ্ধটি ছড়ি তুলে বিশুঠাকুরকে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা বলা হল না।

এই সময় হঠাৎ চিকচিক চিকচিক শব্দ হল। আর কোথা থেকে উড়ে এল অসংখ্য ছোট ছোট কালো রঙের পাখি।

সেই পাখিদের আক্রমণে বৃদ্ধটি, নাদুস-নুদুদসটি আর নিধিরাম সর্দার এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওরে বাবা রে, মা রে, ছেড়ে দে রে!"

এমনকী আলেয়া পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিশুঠাকুর মৃদু জ্যোৎস্নায় দেখলেন, সেখানে রাজপ্রাসাদ নেই, সেই

লোকগুলি নেই, কিছু নেই, কেউ নেই। শুধু আছেন তিনি আর কয়েক শো পাখি।

পাখিগুলো কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করল না। তাঁকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেল কয়েকবার। তারপর বিদ্যুৎ-গতিতে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই গিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

সেই জলাভূমির মধ্যে হঠাৎ আবার সম্পূর্ণ একলা হয়ে যাওয়ায় তাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠল। তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না, কোনো দিক ঠিক না করেই দৌড়োতে শুরু করলেন।

তিনি আর একবারও এদিকে তাকালেন না। যদিও সব সময়ই মনে হচ্ছে, তাঁর পেছনে কে যেন তাড়া করে আসছে। মাঝে-মাঝেই শোনা যাচ্ছে প্রচণ্ড ঢাকের শব্দ। তাতে আকাশ দুলে উঠছে, পায়ের তলার মাটিও দুলে উঠছে।

॥ ৬ ॥

গ্রামটির নাম মুকুন্দধাম। এখানে শুধু বৈষ্ণবরা থাকে। সকাল আর সন্ধ্যায় প্রত্যেক বাড়িতে নামগান হয়। সেই গানের সময় ছেলে-বুড়ো সবাই এক সঙ্গে দু'হাত তুলে নাচে।

এই গ্রামে বিষ্ণুচরণ দাস নামে এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন বিশুঠাকুর। এ-বাড়িতে অনেকগুলো ঘর। সুন্দর আলপনা দেওয়া সব মাটির দেওয়াল। বাড়ির দু'দিকে দুটো পুকুর, সেই পুকুরের জল কাকের চোখের মতন টলটলে। পুকুরের ধারে ধারে বাগান।

অতিথিদের এরা খুব খাতির করে। বিশুঠাকুরকে একটা আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেই রান্না করে খান। খুব চিকন আতপ চালের ফেনা ভাত আর ঘি। সেই সঙ্গে বাড়ির গোরুর দুধ, বাগানের কলা আর নিজস্ব খেজুরগাছের গুড়।

বিশুঠাকুর এই গ্রামে পৌঁছেছিলেন দারুণ ক্লান্ত আর রক্তাক্ত শরীর নিয়ে। জলার মধ্যে দৌড়োবার সময় তাঁর পা শামুক-ঝিনুকে কেটে গেছে। তাঁর মুখে নখ দিয়ে চেরা দাগ। তাঁর গায়ের চাদরটি গেছে, পুঁটলিটিও কখন কোথায় পড়ে গেছে তার ঠিক নেই। তিনি এখন নিঃসম্বল।

মুকুন্দধামে দু'দিন বিশ্রাম নিয়ে ও ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করে তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। এরপর যে তিনি কী করবেন, তা এখনো ঠিক করে উঠতে পারেননি।

এ-বাড়ির একটি ছেলে এর মধ্যেই বেশ ন্যাওটা হয়ে উঠেছে বিশুঠাকুরের। ছেলেটির নাম মনোহর, চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েস। সে সব সময় বিশুঠাকুরের কাছে এসে বসে থাকে।

তৃতীয় দিন সকালে বিশুঠাকুর মনোহরকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম দেখতে বেরুলেন। গ্রামটি ছোট, মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ ঘর লোকের বাস। সকলেই বেশ সুখে শান্তিতে আছে বলে মনে হয়। বিশুঠাকুরকে দেখে গ্রামের অনেক লোক "জয় গুরু' 'জয় গুরু' বলে অভিবাদন জানাতে লাগল। বিশুঠাকুর বৈষ্ণবদের বিষয়ে কিছু কিছু জানেন। তিনিও উত্তর দিতে লাগলেন, 'জয় গৌর! জয় নিত্যানন্দ!'

ক্রমশ গ্রামটি ছাড়িয়ে তারা এসে পড়লেন বাইরের দিকে। এখানে একটা ছোট নদী কুলকুল করে বয়ে চলেছে। তার ওপরে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলেন তিনি।

সেখানেও একটা গ্রাম ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু একটাও মানুষজনের চিহ্ন নেই। সমস্ত বাড়ি পোড়া-পোড়া। অনেক ঘরেরই ছাদ নেই, অনেক দেওয়াল ভেঙে পড়েছে, তাতে কালো কালো দাগ। মনে হয়, কোনো এক সময় বিধ্বংসী আগুনে সেই গ্রামটা একেবারে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

বিশুঠাকুর মনোহরকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঐ গ্রামের এই রকম অবস্থা হল কী করে? কবে হল?"

মনোহর বলল, "আমি তো আমার জন্মকাল থেকেই এরকম দেখছি। ওখানে আমরা কেউ যাই না।"

বিশুঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

মনোহর ভয় পেয়ে বলল, "চলো ঠাকুর, আমরা অন্য দিকে যাই। ও গ্রামের দিকে তাকালেও ভয় করে। ও-গ্রামে যে-ই গেছে, সে-ই মুখে রক্ত তুলে মরেছে।"

"বটে? আমি যদি যাই, আমিও মুখে রক্ত তুলে মরব? একবার গিয়ে দেখি তো!"

"না, না, ঠাকুর। খবর্দার, ওরকম কথা চিন্তাও কোরো না। আমার নিজের ছোটমামা এই করতে গিয়ে মরেছে।"

মনোহর বিশুঠাকুরের হাত চেপে ধরল।

বিশুঠাকুর হেসে বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে, এখন যাব না। কিন্তু ঐ গ্রামটায় এ অবস্থা হল কী করে তা-ও তুমি জানো না?"

"জানব না কেন। মুকুন্দধামের সবাই জানে। সে আমার জন্মের আগেকার কথা। ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি, একরাতে জমিদারের পেয়াদারা এসে ঐ গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়। পেয়াদারা গ্রামের চারপাশ ঘিরে রয়েছিল, একটা লোককেও বেরুতে দেয়নি। সবাই পুড়ে মরেছে। ঐ গ্রামটা ছিল অনেক বড়, আমাদের গ্রামের চেয়ে অনেক বড়।"

"জমিদারের লোক গোটা গ্রামের মানুষকে পুড়িয়ে মারল! কেন?"

"ও গ্রামের কে যেন জমিদারের মেয়েকে চুরি করে এনেছিল। অনেক চোর-ডাকাত থাকত কিনা ঐ গ্রামে!"

"এক গ্রামের সবাই তো আর চোর-ডাকাত হয় না। দু'এক জন হয়। সেই দু'এক জনের অপরাধে গোটা গ্রামের লোককে মরতে হল। এ যে বড় অন্যায় কথা।"

"অন্যায় বলে অন্যায়। জবর অন্যায়।"

"সেই জমিদারের লোকরা তোমাদের গ্রামে কোনো অত্যাচার করেনি?"

"না। আমরা তো বোষ্টম। আর সে জমিদারও ছিল বোষ্টম। আর নদীর ওপারের ঐ গাঁটা ছিল কৈবর্তদের।"

"বৈষ্ণব-জমিদার কৈবর্তদের গ্রাম পুড়িয়ে শত শত লোককে মেরে ফেলল? এ আবার কী রকম বৈষ্ণব? বৈষ্ণবদের তো সকলকেই ভালবাসার কথা।"

"আমার বাবা-কাকারাও সেই কথা বলেন।"

"সে জমিদার কোথায় থাকে? ইচ্ছে করছে, এখুনি একবার সেই জমিদারের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"সে জমিদার তার পাপের শাস্তি পেয়ে গেছে অনেক আগেই। তারা আর কেউ নেই, একেবারে নির্বংশ হয়ে গেছে। এই গাঁটা যেমন এক রাতে পুড়ে ছারখার হয়েছিল, সেইরকম সেই জমিদার বাড়িতেও ফিরিঙ্গি বোম্বেটেরা এসে এক রাতে সবাইকে শেষ করে দিয়েছে।"

“ফিরিঙ্গি বোম্বেটে ? এটা কবেকার কথা ?”

“তা তো আমি বলতে পারব না। তুমি আমার পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞেস কোরো। আমার তো সবই শোনা কথা। সন্ধের পর আমাদের গ্রামে কেউ বাইরে বার হয় না। তবু যদি কেউ কখনও সন্ধের পর এখানে হঠাৎ চলে আসে, সে শুনতে পায় একটা মেয়ের কান্নার শব্দ। সেই যে মেয়েটিকে কৈবর্তরা চুরি করে এনেছিল, সে এখনো কাঁদছে। ঐ দিকে আরও অনেক দূরে যে একটা জলা আছে, সেখানেও নাকি কেউ কেউ সেই মেয়েটিকে কাঁদতে দেখেছে।”

“সেই জলাতে তুমি কখনও গেছ, মনোহর ?”

“ওরে বাবা, আমার তো সেই জলার নাম শুনলেই ভয় করে ! আমরা বোষ্টম, ভূত-প্রেত আমাদের সহ্য হয় না।”

বিশুঠাকুর মনোহরের কাঁধে হাত দিয়ে ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, “ওরকম সব সময় ভয় পেতে নেই। তা হলে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে বাঁচা যায় না। তুমি আমার সঙ্গে ঐ জলায় যাবে ?”

ভয়ে মনোহরের মুখখানা শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেল। সে বলল, “ওরে বাবা, ওখানে কেউ সাধ করে যায় ? ঠাকুর, তুমি নতুন লোক, তাই তুমি কিছু জানো না। ঐ জলায় আছে আলেয়া ও পেত্নি, তার দেখা পেলে আর কেউ বাঁচে না। যে-জমিদারের কথা বললাম, তাঁর নাম ছিল মহাপ্রাবৃট্ সেন। তাঁর ছিল দুই মেয়ে। এক মেয়েকে এই কৈবর্তরা ধরে নিয়ে এসেছিল, আর এক মেয়ে আলেয়া হয়ে যায়। সেই দু'জনকেই এখনো দেখা যায় ঐ জলায়।”

বিশুঠাকুর ভুরু কুঁচকে বললেন, “মহাপ্রাবৃট্ সেন ? এ নাম তো আমি শুনেছি। খুব দুঁদে জমিদার ছিলেন। তা তিনি তো মারা গেছেন অনেক কাল আগে।”

“বললাম তো, এসব আমার জন্মের আগেকার কথা।”

“শুধু তোমার জন্ম কেন, মনোহর এ তো আমারও জন্মের আগের ব্যাপার। সেই অতকাল আগের এক জমিদার এই কৈবর্তদের গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে এখানে আর জনবসতি হয়নি ?”

“না।”

“আশ্চর্য, ভারী আশ্চর্য ব্যাপার ! এরকম কখনো শুনিনি।”

"চলো ঠাকুর, এখান থেকে যাই। তোমায় বরং গোঁসাইমহল দেখিয়ে আনি।"

"সেখানে কী আছে?"

"সে এক বড় সুন্দর জঙ্গল। কতরকম ফুল ফোটে, ফল ফলে থাকে। সে জঙ্গলে হরিণ আছে। দু' চারটে বাঘও আসে মাঝে-মাঝে।"

"এদিকের জঙ্গলে বাঘ আসে? সে বাঘ কখনো কখনো গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে না?"

"তা পড়ে বইকী। তবে আমাদের কোনো ক্ষতি করে না। আমরা তো বোষ্টম, তাই আমরাও বাঘ মারি না, বাঘও আমাদের মারে না।"

বিশুঠাকুর হা হা করে জোরে হেসে উঠলেন। হাসি সামলাতে গিয়ে বিষম খেলেন দু'বার।

একটু পরে বললেন, "বৈষ্ণব বলে বাঘে খায় না। বাপ রে বাপ। এই দুনিয়ায় কত আজব জিনিসই আছে। বাঘ বোধহয় জেনে ফেলেছে যে, বৈষ্ণবদের মাংস নিরামিষ, তাই না? তা হলে, মনোহর, বাঘ দেখে তোমরা ভয় পাও না?"

"না। বাঘ দেখে আমরা ভয় পাই না।"

"তবে যে খানিক আগে বললে, এ গ্রামের কেউ সন্ধের পর বাড়ির বাইরে যায় না? কেন যায় না? কিসের ভয়ে?"

"বাবু, রাত্তিরবেলা যে সেই ভুতুড়ে পাখিগুলো আসে?"

"ভুতুড়ে পাখি?"

"হ্যাঁ। কোথা থেকে যেন আসে ঝাঁক-ঝাঁক ছোট ছোট পাখি, কালো কুচকুচে রং। ঠিক চামচিকের মতন। কিন্তু চামচিকে নয়। সে পাখিগুলোকে মারা যায় না। মারতে গেলেই তাদের গা থেকে আগুনের ফুলকি বেরোয়। আর সেই পাখিগুলো যদি কারুকে ছোঁয়, অমনি তার শরীরের সেইখানটায় ঘা হয়ে যায়। বড় সাংঘাতিক পাখি!"

বিশুঠাকুর ভুরু কুঁচকে বললেন, "সেই পাখি তা হলে এখানেও আসে! তাদের দিনের বেলা কখনো দেখা যায় না?"

"না। সেই জন্যই তো ওগুলোকে ভুতুড়ে পাখি বলে। ঠাকুর, তুমিও ঐ পাখিগুলো দেখেছ নাকি?"

বিশুঠাকুর কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন।

সেদিন সন্ধের সময় মনোহরদের বাড়িতে যথারীতি গানের আসর

বসল। প্রথমে একজন সুর করে পড়ে শোনাতে লাগলেন চৈতন্য চরিতামৃত। বিশুঠাকুর বসে ছিলেন এক কোণে। এক সময় তিনি টুক্ করে উঠে পড়লেন। কারুকে কিছু না বলে চলে এলেন বাড়ির বাইরে।

জ্যোৎস্না-মাখা রাত, কিন্তু গ্রামের পথ একেবারে নির্জন। একটাও মানুষ নেই।

কাছেই সুন্দরবন। গুলবাঘ আর চিতাবাঘ তো যখন-তখন দেখা যায়। বড় বড় মানুষখেকো বাঘ, বুনো মোষ, এমনকী দু'একটা গণ্ডারও মাঝে মাঝে ছিটকে চলে আসে গ্রামের দিকে। এমনিতেই এসব দিকে গ্রামের লোকেরা রাত্তিরে পথ চলতে ভয় পায়। তা বলে কি এপাড়া ওপাড়ায় লোক যায় না? বিশুঠাকুরের নিজের গ্রামেই তো লোকেরা মশাল জ্বালিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যায়।

কিন্তু এই গ্রামটি যেন রূপকথার সেই নিঝুম পুরী। সবাই দরজা জানলা এঁটে বসে আছে।

বিশুঠাকুর ভাবলেন, পাখিগুলো যদি ভুতুড়ে পাখিই হয়, তবে কি তারা বাড়ির মধ্যেও ঢুকে পড়তে পারে না? ঐটুকু-টুকু পাখি তো যে-কোনো জায়গাতেই যেতে পারে।

বিশুঠাকুর দু'বার ঐ পাখির ঝাঁক দেখেছেন। কিন্তু পাখিরা তাঁর কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। জলাভূমির রহস্যময় মানুষগুলো ঐ পাখিদের দেখে আর্তনাদ করেছিল প্রাণভয়ে। তা হলে নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে।

বিশুঠাকুর আপন মনে হাঁটতে লাগলেন গ্রামের রাস্তা দিয়ে। দু'তিনদিন বিশ্রাম নিয়ে শরীর আবার বেশ তাজা হয়ে উঠেছে। শরীরে জোর থাকলে তাঁর মনে কোনো ভয়-ডর থাকে না।

গ্রামের সমস্ত বাড়িরই জানলা-দরজা বন্ধ। অবশ্য শীতকাল এখন। কিন্তু এরা গ্রীষ্মকালে কী করে? দু'একটা বাড়ি থেকেই মাত্র গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আর সবাই এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়।

মস্ত বড় একটা গোল চাঁদ উঠেছে আকাশে। পূর্ণিমা বোধহয় কাছাকাছি। হাওয়া দিচ্ছে শিরশিরে। মনোহরের বাবা বিশুঠাকুরকে একটা মোটা কম্বল দিয়েছিলেন, সেটাই তিনি জড়িয়ে নিয়েছেন গায়ে, তবু যেন শীত মানছে না। এ বছর যেন শীতটা একটু বেশি।

হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দূর চলে এলেন বিশুঠাকুর। কোথাও পাখি-টাখি কিচ্ছু নেই। একটা শান্ত নির্জন রাত। এই রকম রাতে বেড়াতে

ভাল লাগে। আগে যখন বিশুঠাকুর শুধুই মন্দিরের পূজারী ছিলেন, সে সময়ও তিনি রাত্তিরবেলা একা একা ঘুরে বেড়াতেন।

এক সময় তিনি এসে পৌঁছোলেন সেই ছোট নদীটার পাশে। নদীটি ছোট হলেও বেশ স্রোত আছে। শোনা যাচ্ছে তার জলের শব্দ। রাত্তিরবেলা নদীর কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে বড় মধুর লাগে।

অন্য সব কিছু ভুলে সেই জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি নদীর দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে গেলেন।

এরকম ভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ একটা শব্দে তিনি সচকিত হলেন। কুকুরের মতন কী যেন একটা জন্তু ছুটে গেল তাঁর পাশ দিয়ে। তিনি চমকে তাকিয়ে দেখলেন, সেটা কুকুর নয়, একটা শেয়াল।

শেয়ালটাও বিশুঠাকুরকে দেখে একটু দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর অদ্ভুত সুর করে ডাকল, ফে-উ-উ!

সেই ডাক শুনে কেঁপে উঠলেন বিশুঠাকুর। এটা শেয়ালের স্বাভাবিক ডাক নয়। শেয়াল যখন এরকম ফেউ ডাকে তখন বুঝতে হবে যে, কাছাকাছি বাঘ আছে। সর্বনাশ!

হাতে কোনো অস্ত্র নেই, এমন কী, একটা লাঠি পর্যন্ত নেই। খালি হাতে বাঘের সঙ্গে লড়াই করার কথা চিন্তাও করা যায় না। কেউ কেউ অবশ্য পারে, কিন্তু বিশুঠাকুর সে-রকম পালোয়ান নন।

এখন কী উপায়? এদিকে কাছাকাছি কোনো বাড়িঘর নেই। বাঘ যদি কাছাকাছি এসে থাকে, তা হলে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করা চরম নির্বুদ্ধিতা।

মনোহর বলেছিল, এ গ্রামের বৈষ্ণবদের বাঘে খায় না। কিন্তু বিশুঠাকুর তো বৈষ্ণব নন, বাঘ কি তাঁকে ছেড়ে দেবে? বাঘের ওপর এতখানি বিশ্বাস রাখতে পারবেন না তিনি।

সুন্দরবনের বাঘ অতি ধূর্ত। মানুষ দেখলে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না। অতি নিঃশব্দে হাঁটে। খুব কাছে এসে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

একটু দূরেই আর একবার ফেউ ডাকতেই তিনি আর দ্বিধা করলেন না। গায়ের কম্বলটা খুলে ফেলেই তিনি লাফ দিলেন নদীর জলে।

প্রায় পরের মুহূর্তেই তাঁর ছেড়ে যাওয়া কম্বলের ওপর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল একটা চিতাবাঘ।

নদীর জল অসম্ভব ঠাণ্ডা। বাঘও বোধহয় সেই ঠাণ্ডা জলকে ভয় পায়,

তাই সে আর নদীতে নামল না। বিশুঠাকুর ডুব সাঁতার দিয়ে উঠলেন অনেকটা দূরে। মাথা ঘুরিয়ে একবার চিতাবাঘটাকে দেখেই আবার দিলেন ডুব।

মুখের সামনে থেকে এমন একটা শিকার ফসকে যাওয়ায় বাঘটা এবার একটা রাগের হুংকার দিল।

ডুবসাঁতার দিতে দিতেই বিশুঠাকুর পৌঁছে গেলেন নদীর অন্য পারে। এখানেই সেই কৈবর্তদের পুড়ে যাওয়া গ্রাম।

শীতে বিশুঠাকুর ঠকঠক করে কাঁপছেন। এখন কোথাও একটু আগুন পেলে তিনি শরীরটাকে সেঁকে নিতে পারতেন। কিন্তু এ গ্রামে তো জন-মানুষ নেই।

বাঘেরা বেশ ভালই সাঁতার জানে। চিতাবাঘটা যদি নদী পার হয়ে তাড়া করে আসে। এই ভেবে বিশুঠাকুর ছুটতে লাগলেন। ছুটলে তবু একটু গা গরম হয়। পুড়ে যাওয়া বাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়োতে লাগলেন তিনি, বেশ কয়েকবার হোঁচট খেলেন। এতবড় গ্রামটায় মানুষ তো নেই-ই, কোনো জন্তু-জানোয়ারই নেই, কোনো প্রাণের চিহ্নই নেই।

বেশ খানিকটা যাবার পর বিশুঠাকুর থামলেন। মুকুন্দধাম গ্রাম থেকে তিনি অনেক দূরে চলে এসেছেন। এবারে তিনি বুঝলেন, সন্ধে হতে না হতেই কেন ঐ গ্রামের সবাই দরজা জানলা বন্ধ করে থাকে। ভুতুড়ে পাখির ভয়টা আসল নয়, আসল হল বাঘের উপদ্রব। বৈষ্ণবরা বাঘ না মারতে পারে, বাঘেরা কিন্তু বৈষ্ণবদের দেখলেও ছাড়বে না।

বিশুঠাকুর এখুনি আর ওদিকে ফিরতে চাইলেন না। বাঘের মুখে প্রাণ দেবার ইচ্ছে তার নেই।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, অনেক দূরে, মাঠের মধ্যে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। ওখানে কিসের আগুন ? আগুন যখন আছে, তখন মানুষও আছে নিশ্চয়ই।

তিনি এগোতে লাগলেন সেদিকে। কিছুদূর যাবার পর তাঁর মনে হল, সেই আগুন ঘিরে তিন-চার জন লোক বসে আছে। বিশুঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন।

রাত্তিরবেলা মাঠে বসে যারা আগুন পোহায়, তারা তো সাধারণ লোক হতে পারে না ! এমনিতে কে এখন বাড়ির বাইরে থাকবে ? ডাকাত বা

ঠ্যাঙাড়ে হওয়াই সম্ভব।

বিশুঠাকুর আবার ভাবলেন, এমনও হতে পারে, ওটা একটা শ্মশান। ওখানে লোকেরা মড়া পোড়াতে এসেছে।

যাই হোক, ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য বিশুঠাকুর এগোলেন সেদিকে। এদিকে আর বাড়িঘর নেই। শ্মশান থাকে নদীর ধারে, তা হলে কি ওদিকে আর একটা নদী আছে ?

অনেকটা এগিয়ে যাবার পর তিনি আগুনটা আর দেখতে পেলেন না। অথচ আগুন লক্ষ করেই তিনি এগোচ্ছিলেন। তা হলে কি মাঝখানে গাছটাছ কিছু পড়ল ?

সত্যিই সামনে একটা বেশ বড় ঝাঁকড়া গাছ। আর একটু হলেই বিশুঠাকুর সেই গাছে ধাক্কা খেতেন।

গাছটা পেরিয়ে যাবার পর তিনি আগুনটা আবার দেখতে পেলেন। এবারে যেন আগুনটা অনেক দূরে সরে গেছে। তবে সেই একই রকম আগুন, সেই তিন-চারজন লোক আগুন ঘিরে বসে আছে।

তবে কি তাঁর চোখের ভুল হয়েছিল ? অবশ্য ফাঁকা মাঠের মধ্যে দূরত্ব ঠিক বোঝা যায় না। যাই হোক না কেন, ঐ আগুনের কাছে পৌঁছোবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আবার তাঁর খুব শীত করছে। ধুতিটা জবজবে ভিজে। আগুনের কাছে গেলে সেঁকে শুকিয়ে নিতে পারবেন।

এবারে সেই আগুন ও মানুষগুলো ক্রমশ বড় হতে লাগল। বেশ কাছাকাছি পৌঁছোবার পর সেই আগুনের রং হয়ে গেল ধপধপে সাদা।

বিশুঠাকুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ও তো আগুন নয়, আলেয়া। নিয়তি ! নিয়তিই তাঁকে টেনে এনেছে এখানে। নিয়তি কি বাঘের ছদ্মবেশে তাঁকে তাড়া করেছিল, যেজন্য তিনি নদীতে ঝাঁপ দিলেন ? নইলে আজ রাতে তো তাঁর এদিকে আসার কোনো কথা ছিল না।

এখনো ফিরে যাওয়া যায়। তিনি দাঁড়িয়ে একটু দোনোমনা করছিলেন, এমন সময় যেন মাটি ফুঁড়ে একটা লোক উঠে এল। রোগা লিকলিকে চেহারা আর মস্ত বড় গোঁফ। দেখেই চিনলেন, এ সেই নিধিরাম সর্দার।

নিধিরাম চোখ ঘুরিয়ে বলল, "চলো হে ! ঐ দিকে।"

বিশুঠাকুর বুঝলেন, এর হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আগের দিনই তিনি এই রোগা প্যাংলা লোকটির শক্তির পরিচয় পেয়েছেন।

তিনি এগিয়ে গেলেন আলেয়ার দিকে। সেখানে বসে আছে আগের দিনের সেই নাদুসনুদুস মানুষটি, তারও আগের দিন দেখা সেই ঘোড়ার গাড়ির মালিক আর তার পাথরের মূর্তির মতন সহিস।

সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে বিশুঠাকুরকে দেখল।

নিধিরাম সর্দার বলল, "এই যে ছোটকর্তা, নিয়ে এসিছি।"

নাদুসনুদুস লোকটি বলল, "এই যে বিশুঠাকুর, এসে গেছ ? চলো।"

বিশুঠাকুর বললেন, "কোথায় ?"

লোকটি বলল, "এখনো তোমার প্রশ্ন করার অভ্যেস গেল না ? বলেছি না, আমরা উত্তর দিই না ?"

বিশুঠাকুর বললেন, "কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে প্রশ্ন টগবগ করছে। আপনারা কি আমার অপেক্ষাতেই বসে আছেন ? কী করে জানলেন যে, আজ আমি এখানে আসব ?"

লোকটি একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসল। তারপর বলল, "দু'চার ঘা খেলেই ওসব প্রশ্ন ঘুচে যায়। নিধিরামকে বলব নাকি একটু দলাই-মলাই করে দিতে ?"

বিশুঠাকুর বললেন, "থাক। তার আর দরকার নেই। চলুন কোথায় যেতে হবে!"

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে অন্যদের দিকে চেয়ে বলল, "আলেয়া আর তোমরা এখানে থাকো। পাখিগুলোকে সামলাও। আমরা একে নিয়ে যাচ্ছি। ধর রে নিধিরাম, ওর হাত ধর।"

নিধিরাম বিশুঠাকুরের হাত ধরেই ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল। প্রায় যেন উড়ে চলেছে। বিশুঠাকুর দু'তিনবার মাটিতে পড়ে গিয়ে ছ্যাঁচড়াতে লাগলেন, নিধিরাম তবু তাঁর হাত ছাড়ল না।

॥ ৭ ॥

অনেকক্ষণ দৌড়োবার পর এক জায়গায় এসে থামল নিধিরাম। বিশুঠাকুর তাকিয়ে দেখলেন, সামনেই একটা বাড়ির অংশ'। কোনো জমিদারের বাড়ি বলেই মনে হয়। কিন্তু শুধু একটা ঘর দেখা যাচ্ছে, বাকি অংশ অন্ধকারে ঢাকা। আকাশে এখনো ফুট্‌ফুট করছে জ্যোৎস্না, তবু এই অন্ধকার কোথা থেকে এল কে জানে!

নিধিরাম সর্দার বিশুঠাকুরের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, "ভেতরে বডকত্তা বসে আছেন, তাঁকে যেন পেন্নাম করতে ভুলে যেও না!"

নাদুসনুদুস লোকটিও হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছে গেল। তারপর দু'জনে দু'পাশ থেকে বিশুঠাকুরকে ধরে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে।

সেখানে একটা সিংহাসনে বসে আছে একজন ছোট্টখাট্টো মানুষ। খুবই বুড়ো। পরনে একটা গরদের ধুতি আর পাতলা সিল্কের চাদর। মাথার চুল ধপধপে সাদা, কিন্তু চোখদুটি দারুণ উজ্জ্বল। হাতে একটা সোনা-বাঁধানো লাঠি।

বৃদ্ধটি বিশুঠাকুরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে লাগলেন। বিশুঠাকুরও দেখতে লাগলেন ওঁকে।

ঠিক যেমন লোকে গাছের ডাল নোয়ায় সেই রকম ভাবেই নিধিরাম সর্দার বিশুঠাকুরের ঘাড়টা ধরে নিয়ে এল সেই বৃদ্ধটির পায়ের কাছে। সে এমনই বজ্র আঁটুনি যে, বিশুঠাকুর কোনো রকম বাধাই দিতে পারলেন না।

আবার মাথা উঁচু করে বিশুঠাকুর সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?"

বৃদ্ধটি অবাক হয়ে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী হে, এ যে প্রশ্ন করে! একে শিখিয়ে-পড়িয়ে আনোনি? এ ছোকরা পারবে?"

নাদুসনুদুস বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, পারবে। ছোকরার এলেম আছে। সহিস ওকে তুলে আছাড় মেরেছে, নিধিরাম ওকে জলে ছুঁড়ে ফেলেছে, তাও ও জ্ঞান হারায়নি। ভয়ও পায়নি। তবে ওর ঐ এক দোষ, বড় প্রশ্ন করে।"

বৃদ্ধ বললেন, "তবু আমি তো একটু পরীক্ষা না করে সন্তুষ্ট হতে পারি

না। দেখে তো বামুন বলে মনে হচ্ছে। শাক্ত না বৈষ্ণব ?"

বিশুঠাকুর বললেন, "আমি শিবের পূজা করি।"

"শৈব ! ঠিক আছে, তাতে চলবে। লেখাপড়া শিখেছ কিছু ? বলো দেখি মহাপ্রাবৃট্ মানে কী ?"

"প্রাবৃট্ মানে বর্ষা। কথাটা এসেছে বৃষ্ থেকে।"

"মানুষের কখন তিনটে মাথা হয় ?"

"মানুষ যখন আপনার মতন বুড়ো হয়। আপনিই তা হলে জমিদার মহাপ্রাবৃট্ সেন ? কিন্তু আপনি তো মারা গেছেন অনেক দিন আগে।"

"এটা বোঝার জন্য বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। এবার তোমার একটু শক্তি পরীক্ষা করার দরকার। নিধিরাম, এর পা দুটো ধরে উল্টো করে ঝোলা, মাথাটা নীচে থাকবে। দেখি কতক্ষণ সেরকম থাকতে পারে।"

নাদুসনুদুস লোকটিকে তিনি বললেন, "তুই একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়া। দ্যাখ, কৈবর্তগুলো এসে পড়ে কি না।"

সেই লোকটি বলল, "আলেয়ার কাছে অন্য দু'জনকে রেখে এসেছি। কৈবর্ত পাখিগুলো এলে ওদের দিকেই যাবে।"

"তবু তুই দ্যাখ। ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই। জ্বালিয়ে মারল !"

এর মধ্যে নিধিরাম বিশুঠাকুরের পা দুটি ধরে উল্টো করে ঝুলিয়ে ফেলেছে। বিশুঠাকুরের মুখখানা লাল হয়ে গেছে রাগে অপমানে। কিন্তু কিছুই করবার নেই।

জমিদার মহাপ্রাবৃট্ সেন জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাড়িতে কে আছে ? বিয়ে-থা করেছ ? কারণ তোমায় যে কাজে পাঠাব, সেখান থেকে বেঁচে না-ও ফিরতে পারো।"

বিশুঠাকুর বললেন, "শুধু আপনিই প্রশ্ন করবেন, আমি প্রশ্ন করতে পারব না ? তা হলে আমি আর কোনো উত্তরও দেব না।"

"আমাদের বংশে কেউ কখনো অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। তবে ঐ নিধিরাম তো ছোটলোক, ওকে যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারো। কিন্তু সময় বেশি নেই। এই রকম ঝুলে থাকা অবস্থায় যা জানবার জেনে নাও !"

বিশুঠাকুর প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, "কৈবর্ত-পাখি মানে কী ? ঐ পাখিগুলোকে তোমরা ভয় পাও কেন ?"

নিধিরাম বলল. "এ তল্লাটে একটা কৈবর্তদের গ্রাম ছিল। এক ব্যাটা

কৈবর্ত আমাদের মেজকর্তার এক মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যায়। তাকে মেরেই ফেলেছিল। সেই রাগে বড় কর্তা সেই গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে সব ব্যাটা কৈবর্তকে পুড়িয়ে মেরেছেন।"

"একজন কে মেয়ে চুরি করেছিল, সেই দোষে অতগুলো লোককে পুড়িয়ে মারা হল ?"

বড়কর্তা বললেন, "বেশ করেছি ! ও সব বাজে কথা বন্ধ রেখে কাজের কথা কিছু থাকে তো বলো !"

"সেই কৈবর্তরা সব এখন পাখি হয়েছে ? আপনারা তাদের ভয় পান ?"

নিধিরাম বলল, "বড়কর্তাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। যা বলবার আমায় বলো। হ্যাঁ, সেই কৈবর্তগুলো এখন পাখি হয়েছে। ওদের জ্বালায় আমরা বেশিক্ষণ চেহারা ধরে থাকতে পারি না। আমরা চেহারা ধরলেই ওরা তেড়ে আসে। ওদের ছোঁয়া লাগলেই আমাদের সারা গা জ্বলে যায়, ঠিক যেন বিছুটি লাগার মতন, তখন আর আমরা থাকতে পারি না।"

"বেশ হয়েছে, তোমাদের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।"

"মাটিতে মাথাটা ঠুকে দেব ? ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে !"

"এবার বলো, আমায় তোমরা এত কষ্ট দিচ্ছ কেন ? এতে তোমাদের কী লাভ ? আমি তো তোমাদের ক্ষতি করিনি কোনো ! ঐ জলাভূমিতে রাত্তিরের দিকে কেউ এলে তাদেরই বা তোমরা মেরে ফেলো কেন ?"

"আমরা কারুকে মারি না। ভয়েই সব মরে যায়, কিংবা পাগল হয়ে যায়। আমরা শুধু কার কতটা সাহস তাই একটু বাজিয়ে দেখি !"

বড়কর্তা বললেন, "এবারে নামিয়ে দে। এ ছেলেটার শক্তি আছে, তা স্বীকার করতেই হবে। এতক্ষণ ঝুলে রইল, তবু কান্নাকাটি করল না। এর নামডাক যা শুনেছি; তা দেখছি ঠিকই।"

নিধিরাম বিশুঠাকুরকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। বিশুঠাকুর মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন, নিধিরামই আবার ধরে ফেলল তাঁকে।

বড়কর্তা বললেন, "বোসো। মাটিতে বোসো। তোমায় আমি এখন কাজের কথা বলি। মাঝখানে কিন্তু কোনো বাধা দেবে না ! শুধু শুনে যাও। তোমার নাম বিশুঠাকুর। তুমি পর্তুগিজ বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়েছ, তাও জানি। তোমাকে আমাদের দরকার। বহুদিন ধরেই আমরা একজন জ্যান্ত মানুষ খুঁজছি। তাকে দিয়ে একটা কাজ করাব। কিন্তু আজ অবধি

একটাও মানুষ পাইনি। যার সঙ্গেই কথা বলতে যাই, সেই আমাদের দেখে ভয়ে ভিরকুট্টি যায়। হয় জ্ঞান হারায়, নয় মরে, নয় পাগল হয়ে যায়। এই হয়েছে দেশের অবস্থা ! যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তোমায় পাওয়া গেল। এখন—"

বিশুঠাকুর বললেন, "কিন্তু আমি যে এখানে আসব, তা জানলেন কী করে ?"

বড়কর্তা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আবার প্রশ্ন ! ওঃ, নিধিরাম, জবাব দে !"

নিধিরাম বলল, "তোমার ওপর আমাদের নজর ছিল। তুমি সে-ই একদিন হাট থেকে ফিরছিলে, তোমায় সেদিন আলেয়া দেখানো হল, যারা একবার আলেয়া দেখে, তারা ঠিক ফিরে আসে। তুমি যদি না আসতে, তা হলে তোমাকে সেই শিবমন্দির থেকেই ধরে আনা হত।"

বড়কর্তা বললেন, "এবারে শোনো। একেবারে মুখ বুঁজে থাকবে। যে-কোনো সময়ে কৈবর্তরা এসে পড়তে পারে। তাই সংক্ষেপে সারি। আমাদের মস্ত বড় জমিদারি ছিল। লোকে আমায় রাজা বলত। পর্তুগিজ বোম্বেটেরা আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। আমার বংশ নাশ করে দিয়েছে !

মনে হল যেন দুঃখে বড়কর্তার গলাটা ধরে এল। তিনি মাথা হেলান দিলেন সিংহাসনে। বিশুঠাকুর দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন যে, বড়কর্তার চোখ দিয়ে জলের বদলে বেরুচ্ছে একটু একটু ধোঁয়া।

আবার সোজা হয়ে তিনি তেজের সঙ্গে বললেন, "তা বলে ভেবো না, আমাদের শক্তি ছিল না, আমরা লড়াই করতে জানতুম না ! এই যে নিধিরাম, ও ঢাল-তরোয়াল ছাড়াই খালি হাতে একশো-দুশো লোকের সামাল দিতে পারত। কিন্তু বোম্বেটেরা নিয়ে এসেছিল বন্দুক আর কামান। আগুন নিয়ে লড়াই করতে আমরা এখনো শিখিনি। ফিরিঙ্গিরা ঐ আগুনের জোরেই জিতে যায়। যাই হোক, তোমায় কী করতে হবে, বলি। ঐ বোম্বেটেরা আমার একমাত্র ছেলেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। তোমাকে দায়িত্ব দিচ্ছি তাকে উদ্ধার করে আনার।"

বিশুঠাকুর বলে উঠলেন, "সে কী ! এ সব তো বহুকাল আগেকার কথা। আপনার ছেলেকে আমি এখন উদ্ধার করে আনব মানে ? সে কি আজো বেঁচে আছে ?"

বড়কর্তা হাঁক দিলেন, "নিধিরাম !"

নিধিরাম বলল, "আরে সে বেঁচে থাকলে তো কোনো মামলাই ছিল না। তাকে তো ফিরিঙ্গিরা মেরে ফেলেছে, তা ধরো গে, অন্তত পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু ফিরিঙ্গিরা তাকে মেরে পুঁতে রেখেছে মাটির তলায়। আমরা হিন্দু, আমাদের দেহ না পোড়ালে আত্মার মুক্তি হয় না। তাই সে বেরুতে পারেনি। আমাদের সঙ্গে তার দেখা হয় না। আহা রে, মাটির তলায় আমাদের সোনামণির আত্মাটা ছটফট করতেছে রে !"

বড়কর্তা আবার বললেন, "গঙ্গার ধারে ফিরিঙ্গিদের একটা গড় আছে। সেই গড়ের মধ্যে এক জায়গায় মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে আমার বাপধনকে। তোমাকে সেই গড়ের মধ্যে আমরা পৌঁছে দেব। তুমি মাটি খুঁড়ে হাড়গোড়গুলো তুলে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। তা হলেই তোমার কাজ শেষ। তখন আমরা আবার বাপধনকে ফিরে পাব, সে আমাদের সাথে সাথে থাকবে !"

বিশুঠাকুর নিধিরামের দিকে ফিরে বললেন, "তা এ-কাজ তোমরা নিজেরাই করছ না কেন ? তোমাদের তো কত সুবিধে, যখন তখন অদৃশ্য হতে পারো।"

নিধিরাম বলল, "তুমি বামুনঠাকুর হয়ে এই কথা বললে ? এই তোমার বুদ্ধি ? অদৃশ্য হলে কি মাটি খোঁড়া যায় ? তার জন্য চেহারা ধরতে হয় !"

"তবে চেহারা ধরে সেখানে গেলেই পারো ! তাতেই বা ক্ষতি কী ? তোমরা তো একবার মরে গেছ, দ্বিতীয়বার তো কেউ আর তোমাদের মারতে পারবে না ? নাকি সেখানেও কৈবর্ত-পাখিরা তোমাদের তাড়া করে যায় ?"

"ফিরিঙ্গিদের কাছে আমাদের জারিজুরি খাটে না। ওরা তোমাদের মতন আমাদের ভয় পায় না। আমাদের দেখলেই আগুন ছুঁড়ে মারে। আমরা আগুন একেবারে সহ্য করতে পারি না। ভূত-প্রেত-শাকচুন্নি-মামদো-কেরেস্তানি-ব্রহ্মদৈত্য আর আমাদের মতন অসুখী আত্মা, আগুন হল আমাদের যম। শুধু আগুন কেন, জোরালো আলো পড়লেই ঝুরঝুর করে আমাদের চেহারা ভেঙে পড়ে। তোমার জ্যান্ত জাতভাইরা, যারা আমাদের দেখে ভয় পায়, তাদের এটা জানিয়ে দিতে পারো। ফিরিঙ্গিরা এটা ভাল করেই জানে।"

হঠাৎ বড়কর্তার গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হতে লাগল আর আবার ধোঁয়া

বেরুতে লাগল চোখ দিয়ে।

তিনি অতি কষ্টে বললেন, "আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, আর চেহারা ধরে থাকতে পারছি না। ওরে নিধিরাম, তুই তা হলে এই ছোকরাকে ফিরিঙ্গিগড়ে পৌঁছে দিয়ে আয়!"

বিশুঠাকুর বললেন, "দাঁড়ান দাঁড়ান! অত সহজ নাকি! ফিরিঙ্গিদের গড়ে আমি একলা ঢুকলে ওরা তো আমায় মেরে ফেলবে। আমি মানুষ, আমায় মেরে ফেলা সহজ। আপনাদের এ কাজ করতে আমি রাজী হব কেন?"

বড়কর্তা বললেন, "ওরে নিধি, বুঝিয়ে দে।"

নিধিরাম বলল, "তুমি রাজি না হলে তো তোমায় আমরা এখানেই জলে চুবিয়ে মেরে ফেলব। সুতরাং তুমি ফিরে যেতে তো পারছ না! তবু বরং ফিরিঙ্গিগড়ে গেলে নিজের বুদ্ধিতে আর চেষ্টায় তুমি বেঁচে যেতে পারো। অবশ্য কাজ হাসিল না হলে আমরা তোমায় আবার পাঠাব। পঁচিশ বছর ধরে খুঁজে খুঁজে আমরা একটাও সেরকম তেজী লোক পাইনি। এতদিন পর তোমায় পেয়েছি, আর কি ছেড়ে দেব! সুতরাং কাজটা চুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করাই তোমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।"

বিশুঠাকুর বললেন, "আমাকে প্রাণের ভয় দেখিও না। সবাইকে মরতে হবে, আজ না হয় আর একদিন। তা বলে মরার ভয়ে আমি অন্যায় কাজ করতে যাব কেন? তোমরা যখন বেঁচে ছিলে, তখন নিরীহ কৈবর্তদের পুড়িয়ে মেরেছ। আরও যে কত প্রজার সর্বনাশ করেছ তা কে জানে? এখনো তোমরা মানুষদের ওপর অত্যাচার করো, তাদের ভয় দেখাও, মেরে ফেলো। তোমাদের দ্বারা কারুর কোনো উপকার হয় না, তা হলে আমি তোমাদের উপকার করব কেন? থাক তোমাদের জমিদারের ছেলে মাটির তলায় পোঁতা! আমি তুলব না তাকে। আমাকে এবার মারো ধরো যা খুশি করো।"

বড়কর্তার সারা গা থেকেই ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখন। হাত দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি অতি কষ্টে বললেন, "আর চেহারা ধরে রাখতে পারছি না। বয়েস হয়েছে তো অনেক। ঐ নিধিটিধি ওরা এখনো অনেকক্ষণ পারে। তুমি তোমার কাজের বিনিময়ে কী চাও। গুপ্তধন চাও?"

বিশুঠাকুর বললেন, "আমায় লোভ দেখাচ্ছেন? দুনিয়ায় আমার কেউ

নেই, আমি টাকাপয়সার তোয়াক্কা করি না। আমার শুধু একটি জিনিস চাই। আমি এরপর যা প্রশ্ন করব, তার সরাসরি উত্তর দিতে হবে আপনাকে।"

নিধিরাম বিশুঠাকুরের ঘাড় ধরে বলে উঠল, "তবে রে বেল্লিক ! তোর এত বড় আস্পর্ধা ! বড়কর্তাকে প্রশ্ন করবি ? তোর আমি ঘাড় ভাঙব !"

বড়কর্তা বললেন, "ছাড়, ছাড়, ওরে নিধি, ছেড়ে দে ! এ ছোকরার এত সাহস, তবে বোধ হচ্ছে একে দিয়ে কাজ হবে। যদি সত্যিই আমার বাপধনকে ফিরে পাই তার জন্য আজ আমি বংশের নিয়ম ভাঙব। কী জিজ্ঞেস করবে, চটপট বলো।

"আপনি সত্যিই জমিদার মহাপ্রাবৃট সেন ?"

"হ্যাঁ। সত্যি। ছিলাম। তাই ছিলাম।"

"আমি যদি আপনার ছেলের হাড়গোড় ফিরিঙ্গি গড় থেকে তুলে আগুনে পুড়িয়ে দিতে পারি, তা হলে আপনি আর আপনার সাঙ্গোপাঙ্গরা কোনোদিন মানুষের ক্ষতি করবেন না বলুন ? কারুকে ভয় দেখাবেন না। রাত্তিরবেলা কারুর সামনে হাজিরও হতে পারবেন না।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। কথা দিলাম। যদি আমার বাপধনকে মুক্তি দিতে পারো, তবে তাকে নিয়ে আমরা সকলে প্রেতলোকে চলে যাব। আর কখনো চেহারা ধরে এখানে ফিরে আসব না। মানুষ আর কোনোদিন আমাদের দেখা পাবে না। আমাদের দ্বারা আর কারুর কোনো ক্ষতি হবে না।"

"ঠিক ?"

"ঠিক, ঠিক, ঠিক। এই তিন সত্যি করলুম।"

"তা হলে আমি রাজি !"

"তোমার জয় হোক ! নির্বিঘ্নে কাজ উদ্ধার করে "

বড়কর্তা আর বাকি কথাটা বলতে পারলেন না। তাঁর শরীরটা কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল। তারপর ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বিশুঠাকুরের চোখের সামনেই ভেঙে গুঁড়ো হয়ে একেবারে মিলিয়ে গেলেন।

॥ ৮ ॥

বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের আমলে সুবে বাংলার মোগল শাসন খুবই ঢিলে হয়ে পড়ে। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজরা এসে ভিড় করেছে এখানে, মধুর লোভে মৌমাছির মতন। এদের কেউ কেউ

ব্যবসা-বাণিজ্যের ছুতো করে দেশটাকে লুটেপুটে নিচ্ছে, কেউ কেউ করছে সোজাসুজি ডাকাতি। এদের আছে কামান বন্দুক আর বড় বড় জাহাজ, তাই এদের সঙ্গে স্থানীয় জমিদাররা পেরে ওঠে না। সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই।

এদের সাহস এমনই বেড়ে গেছে যে, এরা গঙ্গার ধারে ধারে কয়েকটা দুর্গও বানিয়ে ফেলেছে। লুঠ করা জিনিসপত্র এখানে রাখে। এখান থেকে ক্রীতদাসদের চালান দেয়। হঠাৎ কোনো মুঘল সুবেদার এদিকে এসে পড়লে দুর্গ থেকে কামান দেগে তাদের শেষ করে দেয়।

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব সেই জন্যই তাঁর সেনাপতি শায়েস্তা খানকে শেষ পর্যন্ত পাঠিয়েছেন বাংলায়। শায়েস্তা খান এসে অবস্থা খানিকটা সামলেছেন বটে। পর্তুগিজ দস্যুদের প্রধান সর্দার সিবাস্টিয়ান গঞ্জালভেস টিবাও তার কাছে ধরা পড়ায় তিনি ভেবেছেন যে, জলদস্যুরা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর কেউ উৎপাত করবার সাহস পাবে না।

শায়েস্তা খান এখন বসে আছেন ঢাকায়। তিনি এখন বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করবার ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

এদিকে জলদস্যুরা সবাই ধরাও পড়েনি, পালিয়েও যায়নি। সিবাস্টিয়ান গঞ্জালভেস টিবাও ধরা পড়ার ফলে তারা একটু ভয় পেয়েছে বটে, কিন্তু তারা এ-কথাও জানে যে, মুঘল সেনাপতি শায়েস্তা খান এখানে বেশিদিন থাকবেন না। বড় বড় সেনাপতিরা কেউ রাজধানী থেকে বেশিদিন দূরে থাকে না, থাকলেই তাদের ক্ষমতা চলে যায়। বিদেশী দস্যুরা জানে, শায়েস্তা খান তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে গেলেই তাদের সুদিন আবার আসবে। সেই জন্য এখন তারা নানান কোণে-ঘুপচিতে লুকিয়ে আছে। কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছে দুর্গে।

গঙ্গার ধারে এইরকমই একটা দুর্গ এখনো বেশ আস্ত অবস্থায় টিকে আছে। শায়েস্তা খান আসছেন এই খবর পেয়েই দুর্গটিকে রাতারাতি গির্জা বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে অস্ত্রশস্ত্র সবই লুকনো আছে।

দুর্গটি অবশ্য পর্তুগিজদের নয়, ওলন্দাজদের। তবে পর্তুগিজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের মোটামুটি ভাব আছে। অনেক সময় ক্রীতদাস বা লুটের মাল ওরা ভাগাভাগি করে নেয়।

এই দুর্গেই খুব গোপনে এসে লুকিয়ে আছে গঞ্জালভেসের ভাই আন্তনিও দে রেগো। আন্তনিও তার দাদার চেয়ে কম নিষ্ঠুর নয়, কিন্তু তার

দলটি ছোট। আরাকানের রাজার ভাই আনাপুরমকে খুন করে আন্তানও চট্টগ্রামের দিকে যেতে গিয়ে তার দলবল সমেত আর একটু হলেই ধরা পড়ে যাচ্ছিল শায়েস্তা খানের সৈন্যবাহিনীর হাতে। গঞ্জালভেসকে ধরার পর মুঘল সৈন্যরা যখন উৎসব করছিল, সেই সুযোগে আন্তনিও তার কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী সমেত পালিয়ে আসে হুগলির দিকে। ওলান্দাজ বন্ধুরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে এই দুর্গে। এখানে সে ধর্মযাজকের পোশাক পরে ছদ্মবেশে থাকে।

এই দুর্গের ভেতরকার আমবাগানেই মাঝরাত্তিরে বিশুঠাকুরকে নামিয়ে দিয়ে গেল নিধিরাম।

বিশুঠাকুর একেবারে নিঃসাড়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন একটা আমগাছের ওপরে।

যে গঞ্জালভেসকে তিনিই ধরিয়ে দিয়েছেন শায়েস্তা খানের হাতে, তারই ভাই আন্তনিও যে এখানে লুকিয়ে আছে, তা তিনি জানেন না। আন্তনিও বিশুঠাকুরকে চেনে। একবার যদি দেখতে পায় তা হলে আর রক্ষে নেই।

ভারতবর্ষের লোকেরা বেশি রাত জাগে না। কিন্তু পর্তুগিজ-ওলন্দাজরা সকালে অনেকক্ষণ ঘুমোয় আর সারারাত ধরে ওদের ফুর্তি চলে। তা ছাড়া এখন দিনের বেলা ওরা গির্জার সাধু সেজে থাকে বলে রাত্তিরেই চলে হৈ হল্লা। দুর্গের মাঝখানের চত্বরে রয়েছে অনেক তাঁবু আর ছোট ছোট খড়ের ঘর। বিশুঠাকুর দেখলেন, সেই সব তাঁবু ও ঘরের মধ্যে এখনো লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি ও গান করছে। ঘর বা তাঁবুগুলোর সামনে জ্বলছে একটা করে মশাল।

এরা কোনো সময়েই এদের দুর্গ অরক্ষিত রাখে না। অন্যরা আনন্দ-ফুর্তি করলেও দু'জন সৈন্য চত্বরের দু'পাশ দিয়ে অনবরত হেঁটে চলেছে। একজন একদিকে যাচ্ছে, আর একজন অন্যদিকে।

বিশুঠাকুর অনেকক্ষণ ধরে এসব লক্ষ করলেন। তিনি যেন মনে মনে একটু হতাশ হয়ে পড়েছেন। এখান থেকে কিছু উদ্ধার করা তো দূরের কথা, একটা মাছি গলে যাবারও উপায় নেই মনে হয়। তিনি বাঘের মুখ থেকে বেঁচেছেন, ভূতদের কাছ থেকে বেঁচেছেন, কিন্তু এবার এই দস্যুদের কাছ থেকে নিস্তার পাবার আর বোধহয় কোনো পথ নেই। তবু শেষ চেষ্টা তাঁকে করতেই হবে।

প্রায় শেষ রাত্তির পর্যন্ত বিশুঠাকুর বসে রইলেন সেই গাছের ওপরেই।

আস্তে আস্তে গান-বাজনা ও উৎসবের হৈ-চৈ কমতে কমতে একসময় থেমে গেল। সবাই শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। কিন্তু সৈন্য দু'জন ঠিক পাহারা দিয়ে চলেছে।

বিশুঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দিনের আলো ফুটে গেলে তিনি আর কিছু করতে পারবেন না। তখন ধরা পড়তেই হবে।

বিশুঠাকুর গাছের ডাল বদল করে করে একেবারে ধারের দিকে চলে এলেন। তারপর ওত পেতে রইলেন। একজন সৈনিক সেই গাছতলায় আসতেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর। লোকটিকে তিনি টুঁ শব্দও করতে দিলেন না, তার আগেই তার গলাটা মুচড়ে দিয়ে অজ্ঞান করে ফেললেন।

ওর কোমর থেকে তিনি খুলে নিলেন তলোয়ারটা। একটা কিছু অস্ত্র হাতে পেয়ে তবু তিনি কিছুটা ভরসা পেলেন।

অজ্ঞান সৈন্যটিকে তিনি টানতে টানতে নিয়ে এলেন গাছতলায়। তার জামাটা খুলে বিশুঠাকুর নিজে গায়ে দিলেন। তারপর লোকটির প্যান্টটাও খুলে ফেলে তিনি পরে নিলেন তাঁর ধুতির ওপরেই। লোকটির বিশাল চেহারা, তার পোশাক বিশুঠাকুরের ঢিলেঢালা হল। তিনি ভাবছিলেন যে, পর্তুগিজ সৈন্যর ছদ্মবেশ ধরে তিনি কিছুক্ষণ হাঁটবেন। যাতে অন্য সৈন্যটি কোনো সন্দেহ না করতে পারে।

কিন্তু জুতো? বিশুঠাকুর কোনোদিন জুতো পরেননি। সাহেবদের জুতো তিনি কিছুতেই পরতে পারবেন না। তা ছাড়া সাহেবদের হাঁটাও অন্য ধরনের। তিনি সেই রকম হাঁটতে গেলেই ধরা পড়ে যাবেন। তবু যতক্ষণ এর পোশাক পরে অন্যদের চোখে ধুলো দেওয়া যায়।

অজ্ঞান সৈন্যটির দু' পায়ের মোজা টেনে খুলে ফেললেন তিনি। একটা মোজা ভরে দিলেন ওর মুখে। তারপর ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে অন্য মোজাটি দিয়ে বেঁধেও দিলেন হাত।

এবার তিনি তলোয়ারটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আকাশের অন্ধকার পাতলা হতে শুরু করেছে। ভোর হতে আর দেরি নেই। অন্যদিকের প্রহরীটির দেখা নেই। বিশুঠাকুর এতক্ষণ ধরে ওপরে বসে লক্ষ করেছেন, মাঝে একজন প্রহরী একটু দেরি করে আসে। বোধহয় সে একটু বিশ্রাম নেয়। সুতরাং এর মধ্যেই যা করবার করে নিতে হবে। প্রথমেই তাকে উদ্ধার করতে হবে বড়কর্তার ছেলের হাড়গোড়।

তারপর এখান থেকে পালাবার পথ খুঁজতে হবে।

এমনি-এমনি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলেও কোনো লাভ নেই। তা হলে নিধিরাম আবার বিশুঠাকুরকে ধরে এই দুর্গের চত্বরে ফেলে দিয়ে যাবে। সেরকমই শর্ত হয়েছে।

এই আমবাগানের মধ্যেই কবর-স্থান। বিশুঠাকুর সেখানে এসে দেখলেন,পর পর অন্তত আট দশটা কবর রয়েছে পাশাপাশি। এই দুর্গটা যত পুরনো, সেই তুলনায় আরও অনেক বেশি কবর থাকা উচিত ছিল। কিন্তু জলদস্যুদের বেশির ভাগই মারা যায় জলে অথবা অন্য কোনো গ্রাম-জনপদ আক্রমণ করার সময়। সেসব মৃতদেহ আর বয়ে আনা হয় না।

পর পর আট দশটা কবর দেখে বিশুঠাকুর দমে গেলেন। এর মধ্যে কোন্‌টা বড়কর্তার ছেলের? বড়কর্তার ছেলের হাড়গোড় যে এখানে আছে, তারই বা প্রমাণ কী? এরা শুধু খ্রিষ্টানদেরই কবর দেয়। বড়কর্তার ছেলেকে খুন করে যদি নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থাকে?

অবশ্য নিধিরাম বারবার জোর দিয়ে বলেছে যে, বড়কর্তার ছেলের হাড়গোড় এখানেই পোঁতা আছে।

সময় বেশি নেই, বিশুঠাকুর দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। এইসব দস্যু সঙ্গে কোনো বালক কিংবা স্ত্রীলোক রাখে না। পুরুষগুলোর সব দৈত্যের মতন চেহারা। সুতরাং কোনো কবর খুঁড়ে যদি ছোটখাটো একটা মাথার খুলি আর সেইরকম হাত-পায়ের হাড় পাওয়া যায়, তা হলেই ধরে নিতে হবে যে, সেটাই বড়কর্তার ছেলের। সেই ছেলেটির বয়স ছিল বারো বছর।

কবরগুলির গায়ে ছোট ছোট পাথরে বিদেশী ভাষায় কী সব লেখা আছে। কিন্তু বিশুঠাকুর বাংলা আর সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো ভাষা পড়তে পারেন না।

বিশুঠাকুর খুঁড়তে শুরু করলেন কবর। তলোয়ার দিয়ে কি সহজে মাটি খোঁড়া যায়! একটা কোদাল বা শাবল পেলে অনেক সুবিধে হত, কিন্তু সে আর কোথায় পাওয়া যাবে!

বিশুঠাকুর কবর খুঁড়তে খুঁড়তে অন্যদিকে চোখ রাখছেন। অন্য প্রহরীটি এসে পড়ে কি না দেখবার জন্য। কিন্তু তার পাত্তা নেই।

কবরগুলির গর্ত খুব গভীর নয়। একটু খুঁড়তেই কফিন পাওয়া গেল।

সেই কফিনের ডালা খুলেই বিশুঠাকুর আঁতকে উঠলেন। একটি একেবারে টাটকা মৃতদেহ, এখনো যেন জ্যান্ত রয়েছে। চোখ দুটো খোলা। যেন কটকট করে তাকিয়ে আছে বিশু ঠাকুরের দিকে। বোধহয় দু' তিন দিন আগে কবর দেওয়া হয়েছে। বিকট দুর্গন্ধ যেন ধাক্কা দিল বিশুঠাকুরের নাকে।

তাড়াতাড়ি কফিনের ডালাটা বন্ধ করতে গিয়ে বেশ জোরে শব্দ হল। বিশুঠাকুর দৌড়ে গিয়ে লুকোলেন একটা আমগাছের আড়ালে।

কিন্তু কেউ এল না।

বিশুঠাকুর ভাবলেন, টাটকা কবর যদি এদিকে থাকে, তা হলে পুরনো কবর অন্যদিকে থাকাই স্বাভাবিক। কোথায় যেন একটা কাক ডেকে উঠল। তা হলে আর সূর্য উঠতে দেরি নেই। যে-করেই হোক বড়কর্তার ছেলের কবর তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে।

তিনি উল্টো দিকে চলে গিয়ে আবার একটা কবর খোঁড়া শুরু করে দিলেন। প্রথম কবরটি খোঁড়া তবু যেটুকু সহজ হয়েছিল, এখানে পুরনো কবর খুঁড়তে গিয়ে বোঝা গেল মাটি অনেক শক্ত হয়ে গেছে। তবু আর একটা কফিন খুলতে পারলেন তিনি। এখানে রয়েছে খুব লম্বা একটা মানুষের কঙ্কাল, তার গায়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া পোশাক।

ধৈর্য হারালে চলবে না। সেই কফিন বন্ধ করে আবার ধরলেন পাশেরটাকে। এবার মনে হল তাঁর ভাগ্য ভাল। এই তৃতীয় কফিনটার মধ্যে রয়েছে একটা ছোটখাটো কঙ্কাল বাচ্চা ছেলের বলেই মনে হয়।

দম নিতে নিতে তিনি ভাবলেন, সত্যিই এটা বড়কর্তার ছেলের কফিন ? নাকি সবটাই পণ্ডশ্রম ? এক হিন্দু জমিদারের ছেলেকে ধরে এনে যদি এরা খুন করে, তবে তাকে এরা কষ্ট করে কবর দেবে কেন ? নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই তো পারত। এক হতে পারে, জমিদারের ছেলেকে এরা ধরে এনে ক্রিশ্চান করেছিল। তারপর কোনো কারণে ছেলেটা মরে যায়। তা হলে ওরা ছেলেটাকে কবর দিতে পারে।

যাই হোক, অত আর চিন্তা করার সময় নেই। বিশুঠাকুর সেই কফিনের মধ্যে নেমে পড়ে দ্রুত হাতে হাড়গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন ওপরে। গন্ধে তাঁর পেটের নাড়িভুঁড়ি প্রায় উল্টে আসছে, তিনি নিশ্বাস বন্ধ করে রইলেন।

কাজ সেরে তিনি ওপরে উঠেই দেখলেন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অন্য প্রহরীটি।

একটা মস্ত তামার বাটি সে ধরে আছে দু' হাতে। বোধহয় সে তার সঙ্গীর জন্য কোনো খাবার আনতে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা কবরের ভেতর থেকে হাড় ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে দেখে সে অবাক হয়ে এখানে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমে সে পোশাকের জন্য বিশুঠাকুরকে সন্দেহ করল না। নিজেদের ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল।

আর কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। বিশুঠাকুর ভাবছেন কী করবেন। তাঁর তলোয়ারটা পড়ে আছে একটু দূরে একতাল মাটির নীচে। সেখান থেকে তলোয়ারটা তুলতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। এই লোকটার চেহারা বিশাল, একটা দৈত্যের মতন, খালি হাতে লড়তে গেলে

আর সময় নেই। লোকটা তাঁকে চিনে ফেলেছে। মরিয়া হয়ে বিশুঠাকুর ওর বুকে একটা ঢুঁ মারার জন্য মাথাটা নিচু করলেন। কিন্তু তিনি এগোবার আগেই লোকটি সেই বিরাট তামার বাটিটা দিয়ে খুব জোরে মারলেন বিশুঠাকুরের মাথায়।

সেই একটা আঘাতই যথেষ্ট। বিশুঠাকুরের মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল। তিনি ঘুরে পড়ে গেলেন মাটিতে।

দ্বিতীয় সৈন্যটি এবার পা দিয়ে ঠেলে বিশুঠাকুরের দেহটা ফেলে দিল খোলা কবরটার মধ্যে। তারপর সে নিজের সঙ্গীকে খুঁজতে লাগল। একটু দূরে আমগাছের তলায় সে দেখতে পেল হাত-মুখ বাঁধা প্রথম সৈন্যটিকে। সে তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসতেই বেজে উঠল বিউগ্‌ল। পর পর তিনবার।

এই বিউগল্ ভোর হবার সঙ্কেত। এই সময়ে প্রহরীও বদল হবে।

সেই আওয়াজ শুনেই দ্বিতীয় প্রহরীটি উঠে দাঁড়াল। এখন তার ছুটি, সে এখন আর কোনো কাজ করবে না। সে প্রথম সৈন্যটিকে মুক্ত করল না পর্যন্ত। সে গট্‌গট্ করে এগিয়ে গেল দুর্গের সামনের দিকে।

নতুন দু'জন প্রহরী আসছে সেদিক থেকে। এই প্রহরীটি সংক্ষেপে তাদের ঘটনাটা জানিয়েই ছুটতে শুরু করল নিজের ঘরের দিকে। ওই বিউগ্‌লের শব্দ শোনামাত্র তার ঘুম পায়। এক্ষুনি শুয়ে না পড়লে তার চলবে না।

এই দুর্গের অধিপতির নাম ভ্যান হেংক। দারুণ রাগী মানুষ। প্রায় সারা রাত নেশা ও আমোদ করে সে ঘুমিয়েছে ভোর রাতে। একটা মোটে কবরখানার চোরের জন্য তাকে এত সকালে জাগালে তিনি রেগে যাবেন খুবই। সেই জন্যই নতুন প্রহরী দু'জন কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে বিশুঠাকুরের দেহটা উঁকি মেরে দেখে নিল একবার। তারপর কফিনের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিয়ে তারা বলল, "যাক, ঐ লাশটা এখন ওখানেই থাক।"

ভ্যান হেংক যখন জাগল তখন সূর্য প্রায় মাথার ওপরে এসে গেছে। মুখ হাত ধোবার পর ভ্যান হেংক তার অতিথি আন্তনিও দে রেগোর সঙ্গে প্রাতরাশ খেতে বসল। হাতে গড়া রুটি, ঝলসানো শুয়োরের মাংস আর বুলেপঞ্জ নামে সুরা।

সবে মাত্র খাওয়া শুরু হয়েছে, এমন সময় নতুন প্রহরীদের একজন এসে রাত্তিরের ঘটনাটা জানাল।

ভ্যান হেংক এক ধমক দিয়ে বলল, "যাও, এখন যাও এখান থেকে! খেতে বসেছি, আর এর মধ্যে তোমরা কবর আর লাশের গল্প শোনাতে এসেছ! আর সময় পেলে না?"

কিন্তু আন্তনিও কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী? কী বললে? একটা লোক ঢুকে পড়েছিল এই দুর্গে? রাত্তিরে সে কী করে ঢুকল? সে একা, না দলে আরও কেউ আছে?"

ভ্যান হেংক বলল, "আরে বন্ধু, আগে খাওয়াটা শেষ করো না, তারপর দেখা যাবে।"

আন্তনিও তাকাল ভ্যান হেংকের দিকে। এই ওলন্দাজরা একটু ঢিলেঢালা স্বভাবের হয়, কিন্তু পর্তুগিজরা সদা সতর্ক। তা ছাড়া শায়েস্তা খানের যদি কোনো চর এসে থাকে, তা হলে আর রক্ষা নেই।

আন্তনিও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চলো, আমি লোকটাকে দেখব।"

অগত্যা ভ্যান হেংকও বড় একটা মাংসখণ্ড তুলে নিয়ে সেটা খেতে খেতে চলল আন্তনিওর সঙ্গে।

কফিনের ঢাকনা খুলে বিশুঠাকুরকে দেখেই চিনতে পারল আন্তনিও। ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেল তার মুখ। দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সে আর্তস্বরে বলল, "মঁ দিউ! মঁ দিউ! এ যে সেই হিদেনটা! হে ভগবান, রক্ষা করো! রক্ষা করো!"

ভ্যান হেংক বলল, "কী হল বন্ধু ? অমন করছ কেন ?"

ভয়ে আর কোনো কথাই বলতে পারছে না আন্তনিও। তার মতন একজন দুর্ধর্ষ জলদস্যুকে ওরকম ভয় পেতে দেখে অন্যরা অবাক। ভ্যান হেংক ঝাঁকানি দিতে লাগল তাকে।

আন্তনিও তখন বলল, "আমি চিনি ওকে। ও স্বয়ং শয়তান। ও আমার দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছে, এবার এসেছে আমার সর্বনাশ করতে !"

ভ্যান হেংক বলল, "তুমি কি পাগল হলে বন্ধু ? একটা সামান্য নেটিভ, তাও মরে গেছে, সে তোমার কী সর্বনাশ করবে ?"

আন্তনিও বলল, "ও মরে গেছে ? কক্ষনো না ? বললাম না ও স্বয়ং শয়তান, ওর মৃত্যু নেই ! ওকে তুলে দ্যাখো !"

দু'জন প্রহরী কফিনের মধ্য থেকে বিশুঠাকুরকে টেনে তুলল। একজন তার বুকে কান ঠেকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এখনো বেঁচে আছে বটে।"

আন্তনিও বলল, "দেখলে ? ওকে আমার লোকজনরা অন্তত পাঁচবার মরে যেতে দেখেছে। ও আবার বেঁচে উঠেছে। ও ভারতীয় শয়তান, ওদের কোনো গোপন মন্ত্র আছে।"

তারপর কবরখানার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "ও একের পর এক কবরখানা খুঁড়ে যাচ্ছিল। এর মানে কী ? একটা হিদেন এসে আমাদের কবর খুঁড়বে কেন ? বলো, তোমরা এর কী ব্যাখ্যা দেবে ? ও যদি সামান্য চোর হত কিংবা গুপ্তচর হত, তা হলেই বা এতগুলো পুরনো কবর খোঁড়ার কী কারণ থাকতে পারে ? নিশ্চয়ই এর মধ্যে ওদের মন্ত্রের কোনো ব্যাপার আছে।"

এতক্ষণে যেন ব্যাপারটার গুরুত্ব ভ্যান হেংকের মাথায় ঢুকল। সেও চিন্তিতভাবে বলল, "তাই তো, লোকটা কবর খুঁড়ছিল কেন ? আবার দ্যাখো, একটা কবরের হাড়গোড় বাইরে ফেলে দিয়ে ও কফিনটাকে খালি করছিল। এখন এই লোকটাকে নিয়ে কী করা যায় ?"

আন্তনিও বলল, "চেষ্টা করে দ্যাখো, এই লোকটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা যায় কি না। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

একজন প্রহরী বিশুঠাকুরকে টেনে তুলতে যেতেই আন্তনিও বলল, "সাবধান, সাবধান ! ও কিন্তু মটকা মেরে পড়ে থাকতে পারে। ওকে বিশ্বাস নেই। ও একেবারে সাক্ষাৎ কোব্‌রা সাপ !"

তখন দু'জন সৈন্য খোলা তলোয়ার হাতে দু' দিকে দাঁড়াল, আর

একজন সৈন্য বিশুঠাকুরের টিকির গোছা ধরে টেনে তুলল।

তামার বাটির ঘায়ে বিশুঠাকুরের মাথার পেছন দিকটা অনেকখানি থেঁতলে গেছে। রক্ত থকথক করছে সেখানে। তাঁর যে জ্ঞান নেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভ্যান হেংক বলল,"যেমন ভাবে পারো, ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করো। মাথার ক্ষতটা পরিষ্কার করে দাও!"

তারপর আন্তনিওকে নিয়ে ভ্যান হেংক আবার ফিরে এল খাবার টেবিলে। কিন্তু আন্তনিওর খাওয়ার রুচি চলে গেছে। মুখখানা আমসি করে বলল, "লক্ষণ বড় খারাপ হে, হেংক! আমি যে এখানে আছি তা কেউ জানে না। তবু ঐ শয়তানটা খুঁজে খুঁজে এই গড়ে এল কী করে? ও কি একা এসেছে? এই গড়ের আনাচেকানাচে আর কেউ লুকিয়ে আছে কি না।"

ভ্যান হেংক হেসে বলল, "স্থানীয় লোকেরা কেউ ভয়ে এদিকে আসে না! আর কেউ আসেনি, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি!"

আন্তনিও রেগে উঠে বলল, "কেউ আসতে সাহস পায় না, তবু একজন তো এসেছে?- আর নিশ্চয়ই ও বাইরে খবর পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা রেখেছে।"

ভ্যান হেংক বলল, "ঠিক আছে, আমি আমার লোকদের হুকুম দিচ্ছি। এই গড়ের ভেতরে আর বাইরেও সব জায়গায় খুঁজে দেখে আসবে।"

বলাই বাহুল্য, তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর কারুকে পেল না ওরা। আর সারা দিনের মধ্যে বিশুঠাকুরের জ্ঞানও ফিরল না। কাছাকাছি আর একটি গির্জার পাদরি এদিককার ইউরোপিয়ানদের চিকিৎসা করেন, ডেকে আনা হল তাঁকে। সেই পাদরি অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন।

সেই ঘরের সামনে সারাক্ষণ উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে লাগল আন্তনিও। মাঝে-মাঝে সে শুধু গড়ের পাঁচিলের কাছে এসে গঙ্গার দু'দিকে দেখে যাচ্ছে, কোনো জাহাজ আসছে কি না। যদিও দশজন রক্ষীকে এখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে নজর রাখবার জন্য।

সন্ধের দিকে বিশুঠাকুর চোখ মেলে তাকালেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ঠোঁট ফাঁক করে ঢেলে দেওয়া হল তীব্র আরক। তার ফলে একটা বিষম খেয়ে বিশুঠাকুর মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করলেন।

কাবরু ডোম নামে একজনকে আগে থেকেই তৈরি করে রাখা

হয়েছিল। কাবরু ডোম এই গড়ের নর্দমা পরিষ্কার করে। কিছুদিন আগেই সে ক্রিশ্চান হয়েছে। ফিরিঙ্গিদের ভাষা সে একটু একটু বোঝে। আন্তনিওর দাদা গঞ্জালভেস বাংলা বেশ ভালই জানে, কিন্তু আন্তনিও অনেকদিন গোয়াতে ছিল বলে সেখানকার স্থানীয় ভাষা কিছু শিখেছিল, বাংলা সে জানে না। সে কাবরু ডোমের মাধ্যমে কথা বলবে।

সে কাবরু ডোমকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ওকে জিজ্ঞেস কর, কে ওকে এখানে পাঠিয়েছে ? এখানে কেন এসেছে ? কোনো রকম মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা করলে ওকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেব।"

বিশুঠাকুর চোখ খুলে তাকিয়েছেন বটে কিন্তু কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না। আন্তনিওর বিশাল মুখখানা তাঁর সামনে ঝুঁকে আছে। কিন্তু তাকে তিনি চিনতে পারলেন না। মাথার মধ্যে যেন সমুদ্রের ঢেউ ঝাপটা মারছে।

বিশুঠাকুর কোনো উত্তর দিচ্ছেন না বলে আন্তনিও অস্থির ভাবে বলল, "ওকে আরক খাওয়াও ! ওকে চাঙ্গা করে তোলো !"

ভ্যান হেংক বলল, "ওর হাত পায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দাও, তা হলেই ও ঠিক কথা বলবে !"

সুতরাং দু'রকমই ব্যবস্থা হল। দু'জন জোর করে বিশুঠাকুরের মুখে ঢেলে দিল আরক, আর দু'জন পল্‌তে জ্বালিয়ে ছ্যাঁকা দিতে লাগল তাঁর হাতে আর পায়ে।

বিশুঠাকুর চমকে চমকে উঠতে লাগলেন। তাঁর মাথা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না। এখনো তিনি মনেই করতে পারছেন না যে, তিনি কোথায় আছেন, এই লোকগুলোই বা কে ?

কাবরু ডোম তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বারবার বলছে, "তুমি কে ? কোথা থেকে এসেছ ? কেন এসেছ ?"

কী বলছেন তা না বুঝেই একবার বিশুঠাকুর বিড়বিড় করে বললেন, "আমার নাম বিশ্বেশ্বর ঠাকুর। আমি শিবমন্দিরে পূজা করি।"

এই উত্তর শুনে কাবরু ডোম ভয় পেয়ে গেল। যদিও সে নতুন ক্রিশ্চান হয়েছে, তবু শিবঠাকুরকে সমীহ করে।

সে চোখ বড় বড় করে বলল, "সাহেব, ইনি তো ব্রাহ্মণ ! সাধারণ চোর-ডাকাত তো নন। শিবঠাকুরের পূজা করেন বলছেন।"

পূজা শুনেই আঁতকে উঠে আন্তনিও বলল, "পূজা ! পূজা ! মন্ত্র !

মন্ত্র ! আমি বলেছিলাম না এই লোকটা মন্ত্র জানে ! এ শয়তানের চেলা !”

ভ্যান হেংক বলল, “আমিও শুনেছি ওদের শিবঠাকুর হল ভূত-প্রেতদের নেতা। তবে তো এই লোকটা শয়তানের চেলাই বটে। ও এখানে কেন এসেছে, জিজ্ঞেস কর্। শিগগির বলতে বল্। ও এসে আমাদের গির্জা আর গড় অপবিত্র করে দিয়েছে।”

কাবরু ডোম আবার বিশুঠাকুরের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগল, “ঠাকুর, তুমি কেন এখানে এসেছ ? এ ম্লেচ্ছদের জায়গায় তো তোমার আসার কথা নয়। কেন এসেছ ? কে পাঠিয়েছে ?”

প্রায় অচেতনভাবেই বিশুঠাকুর আবার বিড়বিড় করে বললেন, “আমায় বড়কর্তা পাঠিয়েছে...জমিদার...তার ছেলেকে এখানে কবরে পুঁতে রেখেছে, আমি সেই হাড়গোড় নিতে এসেছি...”

কাবরু ডোম এ-কথার মানে কিছুই বুঝতে পারল না। বামুনঠাকুর হাড়গোড়ের কথা কী বলছেন। হাড়গোড় তো তার মতন ডোমরাই শুধু ছোঁয়।

আন্তনিও ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করল, “কী বলল ? কী বলল ?”

কাবরু ডোমের মুখে কথাগুলো শুনে আন্তনিওর মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। সে বলল, “এ সব কী ? কোড নিশ্চয় ! এর মানে বার করতে হবে। জমিদারের ছেলের হাড়গোড়...এর প্রত্যেকটি কথার নিশ্চয় আলাদা অর্থ আছে। গুপ্তচররা এরকম ভাষা ব্যবহার করে !”

ভ্যান হেংক বলল, “অত্যাশ্চর্য ! অদ্ভুত ! অবিশ্বাস্য ! সত্যিই একবার এক হিন্দু জমিদারের সন্তানকে এখানে ধরে আনা হয়েছিল...ফুটফুটে চেহারা... আমার খুল্লতাত ছেলেটিকে পছন্দ করে ক্রিশ্চান করে পোষ্যপুত্র হিসেবে রাখতে চান...কিন্তু ছেলেটি কয়েকদিনের মধ্যে রক্ত-আমাশয়ে মারা যায়...কিন্তু সে তো বহুকাল আগের কথা...অন্তত পঁচিশ বছর....এ জানল কী করে ?”

আন্তনিও বলল, “এ সবই এই শয়তানের শয়তানি ! আমাদের বোকা বানাতে চায়।”

ভ্যান হেংক বলল, “আর বেশি কথায় কাজ কী, একে এখন শেষ করে দিলেই তো হয় !”

কাবরু ডোম বলল, “সাহেব, বামুন পূজারীকে এমনভাবে মারতে নেই। তাতে আপনাদের অকল্যাণ হবে। ইনি তো আর বাঁচবেনই না মনে

হচ্ছে। এঁকে বরং জলে ভাসিয়ে দিন।”

হেংক গর্জন করে বলল, “চুপ কর! হিদেনের মতন কথা বললে তোরও মুণ্ডু কেটে ফেলব।”

আন্তনিও বলল, “এর কাছ থেকে তো কোনো কথাই বার করা গেল না। লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না। আমি কাল ভোরেই এখান থেকে চলে যেতে চাই। রাত্তিরের মধ্যেই জাহাজ সাজিয়ে ফেলতে হবে। আমার বরং গোয়ার দিকে চলে যাওয়াই ভাল।”

হেংক বলল, “একে বরং তাহলে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও!”

আন্তনিও বলল, “ঠিক বলেছ। একে পেছনে ফেলে রেখে যেতে আমি ভরসা পাব না। মধ্যসমুদ্রে এর হাত-পায়ে পাথর বেঁধে ফেলে দেব। দেখব, তখন এর শয়তানি কীভাবে খাটে।”

বিশুঠাকুর আবার জ্ঞান হারিয়েছেন। হাত-পায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দিয়েও তাঁর জ্ঞান ফেরানো গেল না আর। আন্তনিওর নির্দেশে তাঁর হাত পা শিকল দিয়ে বাঁধা হল। তারপর তাঁর ঘরের সামনে একটা মশাল জ্বেলে একজন প্রহরীকে বসিয়ে রাখা হল সেখানে।

আজ রাতে আর এই গড়ে কোনো ফুর্তির হৈ-চৈ হল না।

আন্তনিওর দু'খানা জাহাজ একটা সরু খালের মধ্যে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে রাখা ছিল। হাল-মাস্তুলও খুলে রাখা হয়েছিল সব। সেগুলো আবার সব ঠিকঠাক করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল অনেকে। আন্তনিও নিজে সব তদারক করতে লাগল। ঠিক হল যে, ভ্যান হেংকও আন্তনিওর সঙ্গে গিয়ে কিছুদিন আরব সাগরের কিনারে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।

মধ্যরাত্রিরও পরে বিশুঠাকুরের জ্ঞান ফিরল। এখনো তিনি সব কথা মনে করতে পারছেন না। তাঁর মাথার এমন জায়গায় সেই তামার বাটিটা দিয়ে মেরেছে যে, মাথার ভেতরটাই যেন গোলমাল হয়ে গেছে।

তিনি একটু উঠে বসতেই হাত-পায়ের শিকলগুলো ঝনঝন করে উঠল। অমনি বাইরে থেকে প্রহরীটি এসে উঁকি মেরে দেখল ঘরের মধ্যে।

বিশুঠাকুর অস্ফুট গলায় বললেন, “জল! আমায় একটু জল দাও!”

প্রহরীটি শুধু জল কথাটার মানে বুঝল। সে বিদ্রূপের সঙ্গে বলল, “দূর, শয়তান, তোকে কে জল খাওয়াবে! সমুদ্রের তলায় ডুবে তখন পেট ভরে

জল খাবি। তার আগে নিজের থুতু ফেলে চেটে খা।"

আবার প্রহরীটি গিয়ে বসল বাইরে।

হাত আর পায়ে জ্বালা করছে, মাথাতেও অসহ্য ব্যথা। বিশুঠাকুর প্রাণপণে বোঝবার চেষ্টা করলেন তিনি কোথায় আছেন। কারা তাঁকে মেরেছে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে তাঁর খানিকটা চেতনা ফিরে এল। আস্তে-আস্তে মনে পড়ল সব কথা। তখন তিনি বুঝলেন যে তাঁর হাত আর পা শিকলে বাঁধা। তাঁর শরীর এমনই দুর্বল যে, মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই নেই।

ঘরের দরজা খোলা। তিনি দেখলেন বাইরে এখানে-সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে মশাল। কিন্তু মানুষজন দেখা যাচ্ছে না বিশেষ। বাইরের প্রহরীটিরও আর সাড়াশব্দ নেই। তৃষ্ণায় তাঁর যেন বুক ফেটে যাচ্ছে।

তিনি আবার বললেন, "জল। কেউ একটু জল দেবে?"

কেউ কোনো সাড়া দিল না।

তিনি উঠে দাঁড়াতে গেলেন। কিন্তু শিকল দিয়ে এমন ভাবে পা বাঁধা যে, ওঠবারও উপায় নেই। তাঁকে ঐ একভাবেই থাকতে হবে।

ঠিক সেইসময় সামনে উপস্থিত হল একটি রোগা, লম্বা মূর্তি। বিশুঠাকুর চিনতে পারলেন, এ হল নিধিরাম সর্দার।

নিধিরাম বিশুঠাকুরের পাশে বসে পড়ে কাতর গলায় বলল, "ওঃ, কী কষ্ট করে যে এসেছি, তা তুমি বুঝবে না। দিনের বেলা চেহারা ধরতে পারি না, আর রাতে এরা এত মশাল জ্বালিয়ে রাখে যে, ধারেকাছে ঘেঁষতে পারি না। আমার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে। বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। ওঠো, তোমার কাজ শুরু করো!"

বিশুঠাকুর বললেন, "আজ আর আমি কিচ্ছু করতে পারব না। আমার শরীরে এক বিন্দু শক্তি নেই!"

নিধিরাম বলল, "তা বললে কি হয়, তোমায় পারতেই হবে। আমি খুলে দিচ্ছি তোমার শিকল। এতগুলো মশালের আগুনের মধ্য দিয়ে এসেছি, আমি বোধহয় এক্ষুনি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাব। উঃ মাগো, কী ব্যথা!"

এই অবস্থার মধ্যেও বিশুঠাকুর হাসবার চেষ্টা করলেন। নিধিরামেরও যদি গায়ে ব্যথা হয়, তা হলে তিনি আর নিজের ব্যথার কথা কী বলবেন!

নিধিরাম বলল, "এই তো আমি তোমার শেকল খুলছি, আমার হাত

পিছলে যাচ্ছে। নাও, হয়েছে বোধহয়। এবার দ্যাখো তো, উঠে দাঁড়াতে পারো কি না।"

বিশুঠাকুর বললেন, "নিধিরাম, আমায় একটু তুলে ধরো। আমি নিজে দাঁড়াতে পারছি না।"

নিধিরাম বলল, "তোমায় ধরব কী, আমার নিজেরই যে আর শক্তি নেই। বিশুঠাকুর, তুমি আমাদের বাঁচাও! বড়কর্তার ছেলেটার আত্মাকে মুক্তি দাও, তারপর আমরা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। আর পারি না। তার ওপর কৈবর্ত-পাখিগুলোর অত্যাচার, বেশিক্ষণ সুস্থির থাকতে দেয় না। আজও আমায় তাড়া করেছিল...ওঃ গেলাম, গেলাম! আর থাকতে পারছি না!"

নিধিরাম অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে বিশুঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর টলতে টলতে এলেন দরজার কাছে। প্রহরীটি হাঁটুতে মাথা গুঁজে ঘুমোচ্ছে। পাশেই জ্বলছে একটা মশাল।

মশালটা তুলে নিয়ে বিশুঠাকুর সর্বশক্তি দিয়ে সেটা দিয়ে মারলেন প্রহরীটির মাথায়। ঝোঁক সামলাতে না পেরে তিনি নিজেও পড়ে গেলেন ওর ওপরে। তাঁর মুখেও কিছুটা আগুনের ছ্যাঁকা লেগে গেল।

আবার উঠে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন প্রহরীটি অজ্ঞান হয়ে গেছে, তার মাথার চুলে আগুন ধরে গেছে। তিনি হাত চাপড়ে চাপড়ে সেই আগুন নেভালেন। তারপর প্রহরীটির পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন খানিকটা দূরে। অতবড় লোকটাকে টেনে আনতে তাঁর দম বেরিয়ে গেল প্রায়।

আবার তিনি মশালটা তুলে নিয়ে ফিরে এসে আগুন লাগিয়ে দিলেন তার ঘরটায়। খড়ের চাল, আগুন ধরতে দেরি হল না। তারপর তিনি আগুন ধরালেন আর-একটি ঘরে।

সে-ঘরটিতে মানুষ ছিল, আগুন একটু জ্বলে উঠতেই তারা জেগে উঠল। বিশুঠাকুর ততক্ষণে সরে গিয়ে মশালটা ছুঁড়ে দিয়েছেন আর একটা তাঁবুর ওপরে।

শুরু হয়ে গেল লোকজনের ছুটোছুটি ও চিৎকার। শীতকাল, আগুনের তেজ খুব বেশি হয় এ সময়, একবার ধরলেই লকলক করে জ্বলে ওঠে।

বিশুঠাকুরের যেন আর কোনো ভয়ই নেই। ধীরে সুস্থে হেঁটে তিনি

এলেন সেই আমগাছগুলোর কাছে। খোলা কফিনের পাশে ছোট ছেলের মাথার খুলি ও কঙ্কাল এখনো পড়ে আছে। সেগুলো তুলে নিয়ে তিনি একটা একটা করে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন সেই সব জ্বলন্ত ঘরের দিকে।

শেষ হাড়টা ছোঁড়ার সময় কয়েকজন প্রহরী তাঁকে দেখতে পেল। তারা যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সকলেরই ধারণা বন্দীর ঘরে আগে আগুন লেগেছে বলে সে সেখানেই পুড়ে মরেছে। তার হাত-পা শিকল দিয়ে বাঁধা, তার বেরুবার কোনো উপায় নেই।

এখন বিশুঠাকুরকে আমগাছতলায় নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।

একজন শুধু সাহস করে পিস্তলের গুলি ছুঁড়ল তাঁর দিকে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় তার নিশানা ঠিক হল না,বিশুঠাকুরের গায়ে লাগল না গুলি।

ওদের আরও ভয় দেখাবার জন্য বিশুঠাকুর হেসে উঠলেন হা-হা-করে।

তারপর তিনি দেয়ালের কাছাকাছি একটা বড় আমগাছে উঠে পড়লেন। কোথা থেকে যেন একটা অলৌকিক শক্তি এসেছে তাঁর শরীরে। একেবারে মগডালে উঠে তিনি উঁকি মেরে দেখলেন অনেক নীচে গঙ্গা।

এর মধ্যে প্রহরীদের ঘোর কেটে গেছে। তারা দল বেঁধে মশাল হাতে ছুটে এল আমগাছের দিকে। বিশুঠাকুর আর দ্বিধা না করে ভগবানের নাম স্মরণ নিয়ে লাফ দিলেন।

জল থেকে আবার ভেসে উঠবার পর বিশুঠাকুর ভাবলেন, তিনি কি সত্যি বেঁচে আছেন, না তিনিও এখন ঐ বড়কর্তা আর নিধিরামদের মতন! গঙ্গার ঠাণ্ডা জলে তাঁর শরীরের জড়তা কেটে গেল অনেকটা। মাথার ওপরে দেখতে পেলেন তারা-ভরা আকাশ। ডানদিকের আকাশটা লাল হয়ে গেছে। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, ফিরিঙ্গিদের দূর্গটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। বড় কর্তার ছেলের হাড়গোড় ঐ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বিশু ঠাকুরের এখন আর কোনও কষ্ট হচ্ছে না। বরং আনন্দ হলো খুব। সার্থকতার আনন্দ। এবারে দু'তিন বারই তাঁর মনে হয়েছিলো, তিনি আর প্রাণে বাঁচতে পারবেন না। জলে ভাসতে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপনমনে বললেন, আ:! বেঁচে থাকা কী সুন্দর!